শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদগণ

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী
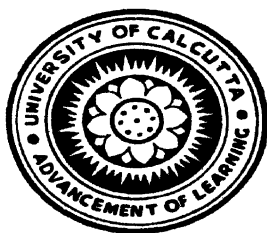
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৫৭

মূল্য ৩·৫০ টাকা

উৎসর্গ

"দাঁড়াও অভেদ আত্মা
পরলোক বেলাভূমে,
বাড়ায়ে দক্ষিণ কর
মৃত্যুর নিবিড় ধূমে।"

—অক্ষয়কুমার বড়াল।

-পরলোকগতা নলিনীবালা দাস স্মরণে—

-গ্রন্থকার

॥ গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ ॥

* বাঙলার রূপ
* স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙলায় উনবিংশ শতাব্দী
* শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙলায় স্বদেশী যুগ
* বাংলা চরিত-গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য
* ভগিনী নিবেদিতা ও বাঙলায় সন্ত্রাসবাদ (যন্ত্রস্থ)
* রাজা রামমোহন রায় (যন্ত্রস্থ)
* কয়েকটি মহাপুরুষের জীবনকথা (যন্ত্রস্থ)
* পাঁচমিশালি প্রবন্ধ (যন্ত্রস্থ)
* বার্গসোঁ-অয়কেন-নিট্‌সে (যন্ত্রস্থ)

ভূমিকা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আহূত হইয়া ১৯৫৬ সালে (২০শে আগষ্ট হইতে ২৫শে আগষ্ট) আমি বিশ্ববিদ্যালয়-ভবনে ছয়টি বক্তৃতা প্রদান করি। তাহাই বর্তমান পুস্তকে সন্নিবেশিত হইল।

দীর্ঘকাল যাবৎ আমি এ-বিষয়ের উপর গবেষণা করিয়াছি, চিন্তা করিয়াছি। আমার সেই দীর্ঘকালের গবেষণালব্ধ জিনিস বিভিন্ন দিক দিয়া পরিমার্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে অর্পণ করিলাম।

এই বক্তৃতাগুলির জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানাইয়া যে-ভাবে সম্মানিত করিয়াছেন, সেই জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

আমার বন্ধু শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ এম-এ, কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রাক্তন মেয়র (Mayor), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার (Treasurer) বর্তমানের এই বক্তৃতাগুলির ব্যাপারে সবদিক দিয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন। বন্ধুকে ধন্যবাদ দিতেছি। শুধু ধন্যবাদ নয়, আন্তরিক অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

'আচার্য্য শ্রীঅদ্বৈত'-এর পাণ্ডুলিপি আমার স্নেহভাজন ছাত্রী শ্রীমতী অনিলা দাশগুপ্ত এম-এ আমার দেওঘর থাকাকালীন

লিখিয়া দিয়াছে। 'শ্রীসনাতন গোস্বামী'-র পাণ্ডুলিপি আমার স্নেহভাজন শ্রীবিমল দত্ত (পালিত লেবরেটরী, সায়েন্স কলেজ) লিখিয়া দিয়াছে।—তজ্জন্য উভয়কে ধন্যবাদ দিতেছি।

আমার পরম স্নেহভাজন শ্রীমান্ সুধাংশু দে এই গ্রন্থের সমস্ত প্রুফ দেখিয়া দিয়া আমার বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লেকচারার, বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত আমার ছয়টি বক্তৃতায় সভাপতিত্ব করিয়াছেন এবং বক্তৃতা সমাপনান্তে শেষের দিন আমার বক্তৃতাগুলির যে-রূপ উচ্চপ্রশংসা করিয়াছেন, তাহাতে আমি তাঁহাকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

১১/১৩ কালীচরণ ঘোষ রোড
কলিকাতা-২
১৫।৮।৫৭

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

॥ ১ ॥

॥ ২ ॥

॥ ৩ ॥

॥ ৪ ॥

আচার্য্য শ্রীঅদ্বৈত

[জন্ম—১৪৩৫ খৃঃ ॥ মৃত্যু—১৫৫০ খৃঃ ॥ ১১৫ বৎসর]

॥ আচার্য্য শ্রীঅদ্বৈত ॥

"ভারতবরষে নাহি আচার্য্য সমান।"

শ্রীচৈতন্যের জন্মের (১৪৮৬ খৃঃ) অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে শ্রীঅদ্বৈত জন্মগ্রহণ করেন (১৪৩৫ খৃঃ)। শ্রীঅদ্বৈতের প্রথম অর্দ্ধশতাব্দীর জীবন-ইতিহাস না-জানিলে, না-বুঝিলে পরের অর্দ্ধশতাব্দীর—শ্রীচৈতন্যের সমকালীন (১৪৮৬—১৫৩৩ খৃঃ) জীবন-ইতিহাস বুঝা যাইবে না। এবং শ্রীচৈতন্যলীলায় শ্রীঅদ্বৈত কোন্ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা যথাযথ নিরূপণ করা যাইবে না।

শ্রীহট্ট জেলার লাউর পরগণায় নবগ্রামে শ্রীঅদ্বৈত জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম শ্রীকুবের তর্কপঞ্চানন। মাতার নাম লাভাদেবী।

জন্ম—শান্তিপুর
আগমন—বিদ্যাশিক্ষা

বাল্যকালে শ্রীঅদ্বৈতের নাম ছিল কমলাক্ষ। ১২ বৎসর বয়সে কমলাক্ষ শ্রীহট্ট (ছিলেট) হইতে শান্তিপুরে আগমন করেন। প্রথম তিনি জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তারপর ষড়দর্শন অধ্যয়ন করিলেন। ষড়দর্শন অধ্যয়ন সমাপ্ত হইবার পর কমলাক্ষের পিতা-মাতা নৌকাযোগে ('তরী আরোহিয়া') শান্তিপুর আসিয়া উপনীত হইলেন। কমলাক্ষের পিতা—

"কুবের কহে বাছা কিবা করিলা পঠন।
প্রভু কহে ষড়দর্শন সমাপ্তোপক্রম।
কুবের কহে পড় এবে বেদ চারিখান।"

—(ঈঃ নাঃ—পৃঃ ২২)

কমলাক্ষ দুই বৎসরে চারিখানি বেদ পাঠ সমাপ্ত করিলেন ('বর্ষদ্বয়ে বেদশাস্ত্র পড়ে সমুদয়')। বেদ পাঠ সমাপন করিয়া বেদ-

পঞ্চানন উপাধি লাভ করিয়া নিজঘরে চলিয়া আসিলেন। তারপর ৯০ বৎসর বয়সে কমলাক্ষের পিতা পরলোক গমন করিলেন। পিতার পরলোক গমনের পর কমলাক্ষ তীর্থপর্য্যটনে বাহির হইলেন। বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়া তবে 'মধ্বাচার্য্য স্থানে প্রভু উত্তরিলা'। সেখানে শাণ্ডিল্যসূত্রে আর নারদসূত্রে ভক্তির ব্যাখ্যান শুনিয়া তাঁহার চিত্তে প্রেম উদ্দীপন হইল। ঠিক এই অবস্থায় মাধবেন্দ্রপুরীর সহিত তথায় কমলাক্ষের দৈবযোগে সাক্ষাৎ হইল। বৈষ্ণবদিগের চারি শাখার মধ্যে মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায় অন্যতম। এই সম্প্রদায়ের একজন প্রধান পুরুষ মাধবেন্দ্রপুরী। কিন্তু পুরী, গিরি, ভারতী—ইঁহারা শঙ্কর বেদান্ত মতে সন্ন্যাসী। অতএব মাধবেন্দ্রপুরী শঙ্কর বেদান্ত মতে সন্ন্যাসী হইয়াও পরে পুনরায় মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের একজন ভক্তিপন্থী পরম বৈষ্ণব। মাধবেন্দ্রপুরী সম্পর্কে কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন: "মাধবেন্দ্রপুরীর কথা অকথ্য কথন। মেঘ দেখিলেই তিনি হন অচেতন॥" ইহা পদাবলীর চণ্ডিদাসে শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়—"কেন মেঘ দেখে রাই অমন হলি।" মাধবেন্দ্রপুরী কমলাক্ষের পরিচয় লইয়া শ্রীমদ্‌ভাগবত, মধ্বাচার্য্য ভাষ্য আরও বিস্তার করিয়া শুনাইলেন। কমলাক্ষ মাধবেন্দ্রপুরীকে বলিলেন যে: আমি যেখানেই যাই সেইখানেই দেখি 'ম্লেচ্ছাচার'; "কৈছে জীবোদ্ধার হইব না পাঁও সন্ধান।" "পুরী কহে কমলাক্ষ তুমি দয়ানিধি। জগতের হিত লাগি ভাব নিরবধি॥" তবে এক্ষণে সাক্ষাৎ পরব্রহ্মের আবির্ভাব বিনে জীব-উদ্ধার সম্ভব নয়। পুরী অনন্ত সংহিতার উল্লেখ করিয়া বলিলেন—"শ্রীকৃষ্ণ গৌর রূপে নবদ্বীপে হইব অবতীর্ণ"।

মাধবেন্দ্রপুরীর সহিত সাক্ষাৎ

তারপর কমলাক্ষ মিথিলা ভ্রমণ করেন। সেখানে, কথিত আছে, বিদ্যাপতির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তখন বিদ্যাপতির বয়স ৭০ বৎসর হইবে।

তারপর একদিন শ্রীমাধবেন্দ্র শান্তিপুরে আসিয়া উদয় হইলেন।

কমলাক্ষ মাধবেন্দ্রের নিকট মন্ত্র লইয়া দীক্ষা গ্রহণ করিলেন—

শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত ও মাধবেন্দ্রপুরী

"কৃষ্ণমন্ত্র-রাজ লইল পুরীরাজ স্থানে"। এই মন্ত্র-রাজ অষ্টাদশ অক্ষরযুক্ত। গোপাল তাপনী উপনিষদে এই মন্ত্রের বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে। পরে সন্ন্যাসী মাধবেন্দ্র কমলাক্ষকে বিবাহ করিতে আদেশ করিলেন—"কৃষ্ণার্থ সংসার কর বিবাহ করিয়া"। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। বৈষ্ণব হইলেই সন্ন্যাস নিতে হইবে না। গৃহী বৈষ্ণবও সম্ভব। অশাস্ত্রীয় নয়।
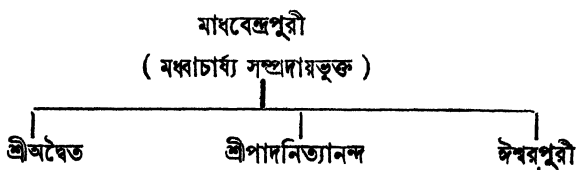
[অনেকের মতে কেশবভারতীও মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। কিন্তু তাহার যথেষ্ট প্রমাণাভাব।]

ঈশান নাগরের মতে ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে হরিদাসের জন্ম হয়। সুতরাং তিনি বয়সে শ্রীঅদ্বৈত অপেক্ষা ১৫ বৎসরের ছোট—"বুড়ন হইতে আইলা হরিদাস"। কিন্তু বুড়ন একটি গ্রাম নয়। ইহা আধুনিক খুলনা জেলার অন্তর্গত একটি পরগণা। এই পরগণার মধ্যে সোনাই নদীর তীরে ভাটকলাগাছি গ্রামে হরিদাসের জন্ম হয়। জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গলে হরিদাসের জন্মপল্লী সম্পর্কে স্পষ্ট লিখিয়াছেন—"স্বর্ণ নদীতীরে ভাটকলাগাছি গ্রাম"। সম্ভবতঃ ১৮ বৎসর বয়সে হরিদাস শান্তিপুরে আসিয়া শ্রীঅদ্বৈতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। হরিদাসের আকৃতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শী ঈশান নাগর লিখিয়াছেন—"আজানুলম্বিত বাহু তেজঃপুঞ্জ কায়"। জয়ানন্দ লিখিয়াছেন—"উজ্জ্বলা মায়ের নাম, বাপ মনোহর"। হরিদাসকে ব্রাহ্মণসন্তান সাব্যস্ত করিবার জন্য উৎসাহী ব্যক্তিরা তাঁহার পিতা মনোহরের

নামের পরে চক্রবর্ত্তী যোগ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার আকৃতি দেখিয়া তাঁহাকে পাঠান বলিয়াই মনে হয়। কেননা, মোগল তখনও বাঙলায় আসে নাই। ভারতবর্ষেও নয়।

আচার্য্য অদ্বৈত হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন: তুমি কোন্ জাতি, তুমি কী উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছ? "ব্রহ্ম হরিদাস কহে মুঞি ম্লেচ্ছাধম"; 'তুয়া পদ দর্শন' করিতে আসিয়াছি। হরিদাস স্পষ্ট নিজেকে 'ম্লেচ্ছাধম' বলিয়া পরিচয় দিলেন। কাজেই তাঁহাকে ব্রাহ্মণকুমার প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা সঙ্গত নয়। অদ্বৈত বলিলেন তুমি এখানে থাকিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র পড়, 'তবে সিদ্ধ হইব মনস্কাম'।

যবন হরিদাসের আগমন

তবে হরিদাস প্রভু অদ্বৈতের স্থানে।
ব্যাকরণ সাহিত্যাদি পড়িলা যতনে॥
ক্রমে দর্শনাদি পড়ি ব্যুৎপত্তি।
শ্রীমদ্ভাগবত পড়ি পাইলা শুদ্ধভক্তি॥

—(ঈঃ নাঃ—পৃঃ ৭১)

যবন হরিদাস শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি।

তারপর অদ্বৈত হরিদাসকে বলিলেন—

ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হেতু লহ হরিনাম।
নাম ব্রহ্ম প্রচারিয়া জীবে কর ত্রাণ॥

—(ঈঃ নাঃ—পৃঃ ৭২)

এত কহি তার মস্তকাদি মুণ্ডাইয়া।
তিলক তুলসী মালা দিলা পরাইয়া॥
কটিতে কৌপীনডোর দিলেন বান্ধিয়া।
হরিনাম দিলা প্রভু শক্তি সঞ্চারিয়া॥
গঙ্গার গহ্বরে পাঞা নাম চিন্তামণি।
প্রেমেতে মাতিলা শ্রীবৈষ্ণবচূড়ামণি॥

—(ঈঃ নাঃ—পৃঃ ৭৩)

এখানে 'বৈষ্ণবচূড়ামণি' অর্থ, যবন হরিদাস। অদ্বৈত এই

মুসলমান বৈষ্ণবের নাম রাখিলেন 'ব্রহ্ম হরিদাস'। প্রাক্-চৈতন্য বৈষ্ণব যুগে আচার্য্য অদ্বৈতের এই কার্য্য কত বড় দুঃসাহস, তাহা যথার্থরূপে ধারণা করা যায় না। মহাপ্রভু ১৫১৪ খৃঃ অক্টোবর মাসে রামকেলী (মালদহ জেলায় গৌড়ের নিকট গ্রাম) আসিয়া হুসেন শাহ'র দুই মন্ত্রী সাকর মল্লিক ও দবীর খাসের সহিত যখন মিলিত হইলেন, তখন মন্ত্রী দুইজন বলিলেন : "ম্লেচ্ছ জাতি, ম্লেচ্ছ সঙ্গী, করি ম্লেচ্ছ কর্ম্ম; গো-ব্রাহ্মণদ্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম।"—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ১ম পঃ)। জন্মে তাঁহারা যাহাই হোন, কর্ম্মে ও জাতিতে তাঁহারা সম্পূর্ণ ম্লেচ্ছ হইয়াছেন। তাঁহাদের স্বীকারোক্তিতে অস্পষ্টতা কিছুই নাই। মহাপ্রভু এই ম্লেচ্ছ, জাতিচ্যুত দুই মন্ত্রীকে 'দোঁহা শিরে দুই হাত দিঞা' বৈষ্ণব ধর্ম্মে শুদ্ধি করিয়া লইলেন। বলিলেন—"আজি হৈতে দোঁহা নাম রূপ সনাতন"। এই বৈষ্ণব ধর্ম্মে মুসলমানকে দীক্ষা দেওয়ার কার্য্যে আচার্য্য অদ্বৈত মহাপ্রভুর অগ্রণী। মহাপ্রভু মথুরা-বৃন্দাবন ভ্রমণকালে (১৫১৫ খৃঃ) পাঠানদের বৈষ্ণব করিয়াছিলেন ; "সেই ত পাঠান সব বৈরাগী হইলা।"

তারপর সীতা ও শ্রী, দুই ভগিনীকে শ্রীঅদ্বৈত বিবাহ করিলেন—

"বিধিমতে ভাদুড়ী দুই কন্যা দান কৈলা।"

তারপরে একদিন হরিদাস আচার্য্যকে কহিলেন—

"অহে প্রভু আজ্ঞা দেহ যাঙ বিরলেতে।
অবিশ্রান্ত হরিনামামৃত আস্বাদিতে॥"

হরিদাস বেনাপোলের গভীর অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং সেখানে কুটির বাঁধিয়া নির্জ্জনে তিনলক্ষ হরিনাম প্রতিদিন জপ করিতে লাগিলেন।

বেনাপোল হইতে লক্ষহীরা বেশ্যাকে উদ্ধার করিয়া পুনরায় শান্তিপুরে ফিরিয়া আসিলেন—"শ্রীপাদ শান্তিপুর আসি উদয় হইল।"

এদিকে—

কুলীন ব্রাহ্মণগণ কহে পরস্পরে ॥
হরিদাসের সঙ্গ যদি না ছাড়ে আচার্য্য।
সমাজেতে সেই সত্য হইবেক বর্জ্জ্য ॥
আচার্য্য তাহাতে নাহি মনোযোগ কৈলা।
প্রভুরে পাষণ্ডিগণ বর্জ্জন করিলা ॥
প্রভু কহে ভাল ভাল অসৎসঙ্গ গেল।
আমাতে শ্রীভগবান্ দয়া প্রকাশিল ॥

পাষণ্ডিগণ কর্ত্তৃক শ্রীঅদ্বৈতকে সামাজিক নির্য্যাতন

—(ঈঃ নাঃ—পৃঃ ১০০)

ইহা একটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। এরূপটি না-হইলেই অস্বাভাবিক হইত। এবং অদ্বৈত-চরিত্রের দৃঢ়তা ও বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিত না। বিশেষতঃ তিনি সন্ন্যাসী নহেন, স্ত্রীপুত্র লইয়া উত্তম গৃহস্থ। চারিদিকে কুলীন-ব্রাহ্মণসমাজ, তার মধ্যে থাকিয়া মুসলমানের প্রতি এই উদারতা জাতিভেদভঙ্গকারী ভবিষ্যৎ বৈষ্ণব সমাজের পূর্ব্বাভাস। আচার্য্য অদ্বৈত ইহার অগ্রদূত। বৃন্দাবনদাস চৈতন্য ভাগবতে লিখিয়াছেন—

হরিদাস কহে গোসাঞি করি নিবেদন।
মোরে প্রত্যহ অন্ন দেহ কোন প্রয়োজন ॥
মহা মহা বিপ্র হেথা কুলীন সমাজ।
আমারে আদর কর না বাসহ লাজ ॥
অলৌকিক কার্য্য তোমা কহিতে পাই ভয়।
সেই কৃপা করিবে যাতে তোমা রক্ষা হয় ॥

—(চৈঃ ভাঃ)

প্রত্যুত্তরে আচার্য্য অদ্বৈত বলিলেন—

আচার্য্য কহেন তুমি না করিহ ভয়।
সেই আচরিব যেই শাস্ত্রমত হয় ॥
তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন।
এত বলি শ্রাদ্ধপাত্র করাইল ভোজন ॥

—(চৈঃ ভাঃ)

ব্রাহ্মণের শ্রাদ্ধপাত্র মহাপ্রভু হরিদাসকে খাওয়াইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা অদ্বৈতের খাওয়াইবার অনেক পরে।

এই পর্য্যন্ত প্রাক্-চৈতন্য শ্রীঅদ্বৈতকে আমরা পাইলাম। কিন্তু আরও একটু বাকী আছে।

শান্তিপুর থাকিতে এবং শ্রীচৈতন্যের জন্মের পূর্ব্ব হইতেই শ্রীঅদ্বৈত কৃষ্ণকে অবতীর্ণ করিবার জন্য—"হুঙ্কার করয়ে ঘনে ঘনে। হরিদাস প্রেমাবেশে করয়ে নর্ত্তনে॥"—(ঈঃ নাঃ)।

কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

কৃষ্ণ অবতার লাগি করেন চিন্তন।
বৈষ্ণব জগৎ কেমনে হইবে মোচন॥
কৃষ্ণ অবতারিতে অদ্বৈত প্রতিজ্ঞা করিলা।
জল তুলসী দিয়া পূজা করিতে লাগিলা॥

—(চৈঃ চঃ)

আবার অন্যদিকে—

হরিদাস করে গোঁফায় নামসংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবেন এই তার মন॥

—(চৈঃ চঃ)

তারপরে—

দুইজনের ভক্ত্যে চৈতন্য কৈল অবতার।
নামপ্রেম প্রচারি কৈল জগৎ উদ্ধার॥

—(চৈঃ চঃ—অন্ত্য, ৩য় পঃ)

এখানে চরিতামৃত স্পষ্টই বলিলেন যে—দুইজনের ভক্তিতে চৈতন্য অবতার হইলেন।

একটি অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করিতে হইতেছে।

অদ্বৈত ও যবন হরিদাসের ভক্তিতে শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণের অবতার হইলেন

শ্রীঅদ্বৈত গঙ্গাজল আর তুলসী দিয়া কৃষ্ণকে অবতীর্ণ করিবার জন্য পূজা করিলেন। ঐ তুলসী, জল ও পুষ্পাঞ্জলি গঙ্গায় নিক্ষেপ করিলেন। স্রোতের বিপরীত দিকে ঐ পুষ্পাঞ্জলি উজান চলিতে লাগিল।

শ্রীঅদ্বৈত—

কৃষ্ণ কৃপা মানি ধাঞা চলে তার সাথ ॥
হরিনাম স্মরি হরিদাস পিছে ধায়।
পুষ্পাঞ্জলি উপনীত হৈল নদীয়ায় ॥
প্রভু কহে শুন আর প্রিয় হরিদাস।
এই গ্রামে কৃষ্ণচন্দ্র হইব প্রকাশ ॥

—(ঈঃ নাঃ—পৃঃ ১০৬)

নিমাই তখন শচীগর্ভে ছিলেন। গর্ভবতী শচীমাতা তখন 'গঙ্গাস্নানে আইলা'। সেই পুষ্পাঞ্জলি 'তান অঙ্গে হইলা স্থিতি'। আচার্য্য অদ্বৈত মনে বিচার করিলেন যে—এই গর্ভে 'কৃষ্ণচন্দ্রের প্রকট সম্ভবে'।

লোচন চৈতন্যমঙ্গলে লিখিয়াছেন যে—শ্রীঅদ্বৈত গর্ভবতী শচীমাতাকে সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিলেন। শচীমাতা আস্তেব্যস্তে অতিশয় কুণ্ঠিতা হইয়া পড়িলেন। ঈশান নাগর ও লোচন ছাড়া অন্য কোন চরিতকার এইসব কথা লেখেন নাই।

শ্রীঅদ্বৈত এই সময় নবদ্বীপে 'টোল কৈলা গৌরাঙ্গ লাগিয়া'। হরিদাসও সঙ্গে ছিলেন। সুতরাং ১৪৮৫ খৃঃ শ্রীঅদ্বৈত ও ঠাকুর হরিদাসের প্রথম নবদ্বীপ আগমন—ধরিয়া লইতে পারি। শ্রীঅদ্বৈত দিনে গীতা, ভাগবত, বেদ, স্মৃতি টোলে পড়ান। রাত্রে হরিদাসের সঙ্গে হরিনামসংকীর্ত্তন করেন।

শ্রীঅদ্বৈত এই সময় নবদ্বীপে প্রাক্‌-চৈতন্য বৈষ্ণব সমাজে নেতৃত্ব করিতেছিলেন। শ্রীবাসাদি বৈষ্ণবেরা 'দুই দণ্ড থাকি অদ্বৈত সভায়' যে-যার-বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইতেন। তাঁহাদের একত্রে মিলিয়া আলাপের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল না। শ্রীবাসেরা চারি ভাই নিশা হইলে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম গান করিতেন। দিনে পারিতেন না। পাষণ্ডী ও যবনরাজ ভীতি—এই দুই উচ্চৈঃস্বরে হরিনামের বিরোধী। শ্রীচৈতন্যের জন্মের অব্যবহিত পূর্ব্বে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে নবদ্বীপে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করা নিরাপদ

ছিল না। কেননা, 'মহাতীব্র যবন নরপতি' ইহা শুনিলে জাতি প্রাণ কিছুই রাখিবে না। পাষণ্ডিরা শ্রীবাসের ঘর ভাঙ্গিয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দিবার প্রস্তাব করিল। এই পাষণ্ডিগণের মধ্যে ব্রাহ্মণরাও ছিলেন। কেননা, "ব্রাহ্মণ ধরিয়া রাজা জাতি প্রাণ লয়"।—(জয়ানন্দ, চৈঃ মঃ—নদীয়া খণ্ড, যবন উপদ্রব)। যজ্ঞসূত্র কাঁধে দেখিলে আর রক্ষা নাই।

আচার্য্য অদ্বৈত এই কথা শুনিলেন।

শুনিয়া অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নি হেন জলে।
দিগম্বর হই সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে বোলে॥
শুন শ্রীনিবাস গঙ্গাদাস শুক্লাম্বর।
করাইব কৃষ্ণ সর্ব্ব নয়ন-গোচর॥
সবা উদ্ধারিবে কৃষ্ণ আপনে আসিয়া।
বুঝাইব কৃষ্ণ ভক্তি তোমা সবা লৈয়া॥
যবে নাহি পারোঁ তবে এই দেহ হইতে।
প্রকাশিয়া চারি ভুজ চক্র লইমু হাতে॥
পাষণ্ডীরে কাটিয়া করিমু স্কন্ধ নাশ।
তবে কৃষ্ণ প্রভু মোর, মুঞি তাঁর দাস॥
এই মত অদ্বৈত বলেন অনুক্ষণ।
সংকল্প করিয়া পূজে কৃষ্ণের চরণ॥

—(চৈঃ ভাঃ—আদি, ২য় অঃ)

জয়ানন্দে পাই—যবনরাজ অত্যাচার। বৃন্দাবনদাসে পাই—তার প্রতিক্রিয়া। অদ্বৈত এই প্রতিক্রিয়া।

তিনটি কথা লক্ষ্য করিবার বিষয়। ১ম—শ্রীঅদ্বৈত প্রাক্-চৈতন্য বৈষ্ণবদের আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন যে, "করাইব কৃষ্ণ সর্ব্ব নয়ন-গোচর।" কৃষ্ণ আগমনের সময় হইয়াছে, কৃষ্ণ আসিবেন, আসিতেছেন। ২য়—আর একান্তই যদি কৃষ্ণ না-আসেন, তবে আমিই কৃষ্ণের অবতার হইব, "প্রকাশিয়া চারি ভুজ চক্র লইমু হাতে"। কেননা, পাষণ্ডীদলন আর যবনরাজভীতি দূরীকরণ—এই দুই কার্য্যের

কৃষ্ণ-অবতারের প্রয়োজন

কৃষ্ণের অবতার ও আগমন একান্ত প্রয়োজন। তবে—প্রয়োজন বৃন্দাবনের কৃষ্ণকে নহে; মথুরা বা কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণকেই অদ্বৈত 'অবতারিবারে' আশা করিতেছিলেন, সঙ্কল্প করিতেছিলেন ও হুঙ্কার করিতেছিলেন। ত্রিভঙ্গ মুরলীধরের হাতে বাঁশের বাঁশী তিনি চান নাই, চাহিয়াছিলেন চক্র—কংস শিশুপালাদি বধে, কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার্থে, এমন কি ভীষ্মবধে সমুদ্যত বিদ্যুৎবর্ষী নিয়ত ঘূর্ণায়মান চক্র। আর চাহিয়াছিলেন, যবন-রাজভীতি দূরীকরণ ও পাষণ্ডীর বিনাশ। ইহাই প্রথম সংকল্প। বৃন্দাবনদাস নিমাইয়ের কৃষ্ণের অবতার হওয়ার কারণ, তাহার ভূমিষ্ঠ হওয়ার কিছু পূর্ব্বের সামাজিক আবেষ্টনীর মধ্য হইতেই পরিষ্কার খুলিয়া দেখাইয়াছেন। অপ্রাকৃত, অলৌকিক বা অস্পষ্ট কিছুই দেখা যাইতেছে না। 'স্বাদিতে নিজ মাধুরী'র—নামগন্ধও অদ্বৈতের প্রথম সংকল্পে নাই।

নিমাইয়ের জন্মের পূর্ব্বে কৃষ্ণভক্তদের মধ্যে আচার্য্য অদ্বৈত অগ্রগণ্য। নিমাই নিজমুখে বলিয়াছেন, 'ভারতবরষে নাহি আচার্য্য সমান' (—লোচন)। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ। কৃষ্ণভক্তি তিনি ব্যাখ্যা করেন। তিনি 'সিংহ' নামে খ্যাত।—

> তুলসীর মঞ্জরী সহিত গঙ্গাজলে।
> নিরবধি সেবে কৃষ্ণ মহা কুতূহলে॥
> হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণ আবেশের তেজে।
> সে ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদি বৈকুণ্ঠেতে বাজে॥
> যে প্রেমের হুঙ্কার শুনিয়া কৃষ্ণনাথ।
> ভক্তিবলে আপনে সে হইলা সাক্ষাৎ॥
>
> —(চৈঃ ভাঃ—আদি, ২য় অঃ)

অদ্বৈতের 'হুঙ্কারে' নিমাই কৃষ্ণের অবতার হইয়া জন্মিতেছেন। অদ্বৈত কৃষ্ণের অবতার চান। বিনা উদ্দেশ্যে চান না। জীবের উদ্ধারের জন্য চান।—

"স্বভাবে অদ্বৈত বড় কারুণ্য হৃদয়।
জীবের উদ্ধার চিন্তে হইয়া সদয়॥"

করুণা না-থাকিলে জীব-উদ্ধারের চিন্তা আসে না। অদ্বৈত শুধু আচার্য্য নন, শুধু সিংহ নন। তিনি করুণার অবতার। সমস্ত লীলারই তিনি অগ্রদূত। এই জীব-উদ্ধারের জন্য কৃষ্ণ অবতারের প্রয়োজন। অদ্বৈতের বড় আশা—

মোর প্রভু আসি যদি করে অবতার।
তবে হয় এসকল জীবের উদ্ধার॥
তবে শ্রীঅদ্বৈত সিংহ আমার বড়াঞি।
বৈকুণ্ঠ-বল্লভ যদি দেখাও হেথাঞি॥
—(চৈঃ ভাঃ—আদি, ২য় অঃ)

কথাটা পরিষ্কার হইয়া গেল। প্রথম কথা—চাই জীব-উদ্ধার। দ্বিতীয় কথা—চাই তার জন্য দ্বাপরের কৃষ্ণের মত একজন শক্তিশালী নেতা। নিমাইয়ের জন্মের পূর্ব্বে বৈষ্ণব সমাজে এমনি একটা গুরুতর প্রস্তাবনা চলিতেছিল। সেই প্রস্তাবনার নেতৃত্ব করিতেছেন বৈষ্ণবাগ্রগণ্য আচার্য্য অদ্বৈত, যিনি 'সিংহ' নামে খ্যাত।

শুধু অদ্বৈত নহেন, যবন হরিদাসও এই সময় কৃষ্ণকে অবতীর্ণ করিবার জন্য গোঁফায় বসিয়া নামসংকীর্ত্তন করিতেছেন। অদ্বৈত ও হরিদাস—একজন হিন্দু ও একজন মুসলমান। ইঁহারা দুইজনে একত্রে কৃষ্ণকে অবতীর্ণ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। হরিদাসের চেষ্টাকে উপেক্ষা করিলে অপরাধ করা হইবে। কবিরাজ গোস্বামী হরিদাসের চেষ্টাকে অদ্বৈতের চেষ্টার সহিত সমানভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।—

কৃষ্ণ অবতারিতে অদ্বৈত প্রতিজ্ঞা করিল।
জল তুলসী দিয়া পূজা করিতে লাগিল॥
হরিদাস করে গোঁফায় নামসংকীর্ত্তন।

কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবেন এই তার মন ॥
দুই জনের ভক্ত্যে চৈতন্য কৈল অবতার।
—(চৈঃ চঃ—অন্ত্য, ৩য় পঃ)

দুই জনের ভক্তিতে শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণের অবতার হইলেন। নিমাই অবতার হওয়ার পূর্ব্বেই আমরা যবন হরিদাসকে গোঁফায় বসিয়া নামসংকীর্ত্তন করিতে দেখিতেছি। যবন হরিদাস অদ্বৈতের মতই একজন প্রাক্-চৈতন্য কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব। তিনি আচার্য্য অদ্বৈতের একজন অনুগত শিষ্য।

১৪৮৬ খৃঃ শুক্লা ফাল্গুনী পূর্ণিমায় নিমাই ভূমিষ্ঠ হইলেন।

নিমাইয়ের জন্ম

নিমাইয়ের অগ্রজ বিশ্বরূপ আচার্য্য অদ্বৈতের টোলে গীতা পড়িতেন।

নিমাই যখন পাঁচ-ছয় বৎসরের উলঙ্গ শিশু মাত্র, তখন নিমাই বিশ্বরূপকে ভোজনের জন্য ডাকিতে আসিতেন।—

রন্ধন করিয়া শচী বলে বিশ্বম্ভরে।
তোমার অগ্রজে গিয়া আনহ সত্বরে॥

'দিগম্বর সর্ব্ব অঙ্গ ধূলায়-ধূসর' নিমাই, অদ্বৈতের সভায় আসিয়া দাদাকে বলিতেন—

ভোজনে আইস ভাই ডাকয়ে জননী।
অগ্রজ বসন ধরি চলয়ে আপনি॥
—(চৈঃ ভাঃ—আদি, ৬ষ্ঠ অঃ)

শিশু নিমাইকে দেখিয়া শ্রীঅদ্বৈত বলিয়াছেন—"চিত্ত বৃত্ত হরে শিশু সুন্দর দেখিয়া"। সুতরাং পাঁচ-ছয় বৎসর বয়সের উলঙ্গ নিমাইকে যে তিনি নবদ্বীপে দেখিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল।

শ্রীঅদ্বৈত ও শিশু নিমাই

ঠাকুর হরিদাস নিমাইর পাঠ্যাবস্থায় দশ বৎসর বয়সে জগন্নাথ মিশ্রের মৃত্যুসময়ে (১৪৯৬ খৃঃ) যে তাকে নবদ্বীপে দেখিয়াছিলেন, তাহারও প্রমাণ আছে।—

গুরুগৃহে গৌরাঙ্গ পুস্তক লেখেন যথা।
রড়দিয়া হরিদাস ঠাকুর গেলেন তথা ॥
হরিদাস ঠাকুর বলেন কি পুঁথি লেখ।
তোমার বাপ অন্তর্জলে ঝাট গিয়া দেখ ॥
—(জয়ানন্দ, চৈঃ মঃ—নদীয়া খণ্ড)

ঠাকুর হরিদাস নবদ্বীপে এক বৃক্ষের কোটরে বাস করিতেন—একথাও জয়ানন্দই বলেন। অতএব নিমাইর বাল্যকালে শ্রীঅদ্বৈত ও ঠাকুর হরিদাসকে আমরা নবদ্বীপেই দেখিতে পাই।

গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর অদ্বৈতের সহিত নিমাইয়ের সাক্ষাৎ

নিমাই পণ্ডিত গয়া হইতে ফিরিয়া অতিশয় বিনয়ী বৈষ্ণব হইলেন।—শ্রীঅদ্বৈতের কাছে এই খবর গেল। তিনি বলিলেন—"বড় সুখী হইলাম এ কথা শুনিয়া"। দাম্ভিক নিমাই যে সহসা এতটা বিনয়ী বৈষ্ণব হইবেন, ইহা অতি আশ্চর্য্য কথা। গয়া হইতে ফিরিবার পরে নিমাইয়ের বিনয়ী স্বভাব ও বৈষ্ণবতা দেখিয়া শ্রীমান্ পণ্ডিত বলিয়াছিলেন—"পরম অদ্ভুত কথা, মহা অসম্ভব। নিমাই পণ্ডিত হলো পরম বৈষ্ণব ॥"—(চৈঃ ভাঃ—মধ্য, ৬ষ্ঠ অঃ)। ইহা ১৫০৯ খৃঃ জানুয়ারী মাসের ঘটনা। তার্কিক উদ্ধত নিমাই পণ্ডিতের বিনয়ী বৈষ্ণব হওয়া "পরম অদ্ভুত কথা, মহা অসম্ভব"। আচার্য্য অদ্বৈত একেবারে নিঃসন্দেহ হইতে পারিলেন না। বলিলেন, "যদি সত্য বস্তু হয় তবে এইখানে। সভে আসিবে এই বামনার স্থানে॥" সম্ভবতঃ নিমাই পণ্ডিত শ্রীঅদ্বৈতের এই কথা শুনিয়া থাকিবেন। কেননা, তিনি গদাধরকে সঙ্গে লইয়া সেই বামনার স্থানে গেলেন। শ্রীঅদ্বৈত তখন কৃষ্ণ অবতারিবার জন্য "বসিয়া করয়ে জল তুলসী সেবন"। তখনকার অদ্বৈতের বর্ণনা এইরূপ (এই প্রসঙ্গে আমি আমার 'বাংলা চরিত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য'-তে লিখিয়াছি)—

মহামত্ত সিংহ যেন করয়ে হুঙ্কার।
ক্রোধ দেখি যেন মহা রুদ্র অবতার ॥

এই 'মহারুদ্র অবতার' নিমাইকে দেখিবামাত্র—

পাদ্য-অর্ঘ্য, আচমণী লই সেই ঠাঞি।
চৈতন্য চরণ পূজে আচার্য্য গোঁসাঞি ॥
গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, চরণ উপরে।
পুনঃ পুনঃ এই শ্লোক পড়ি নমস্কারে ॥
—(চৈঃ ভাঃ—মধ্য, ২য় অঃ)

"নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গো-ব্রাহ্মণ হিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥" বৈদিক ধর্ম্ম রক্ষারই একটা ইঙ্গিত আমরা পাইতেছি। আর তার সঙ্গে—'জগদ্ধিতায় জগতাং হিত সাধকায় নমো নমঃ'। বৈদিক ধর্ম্ম রক্ষাকারী ব্রাহ্মণ এখন জীব উদ্ধার করুন।

ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুতর, অথচ অকস্মাৎ ইহা ঘটিয়া গেল। গদাধর বড়ই কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। 'জিহ্বা কামড়াইয়া' আচার্য্যকে বলিলেন: "বালকেরে গোসাঞি এমত করিতে না জুয়ায়"। অদ্বৈতের কাছে নিমাই তো বালক মাত্র। আচার্য্য বলিলেন: গদাধর! 'বালক, জানিবে কথোদিনে।'

জানিবার জন্য আর বেশীদিন অপেক্ষা করিতে হইবে না। অদ্বৈত ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। গদাধর তা নহেন। এইখানে উভয়ের পার্থক্য।

তারপর নিমাই দুইকর জুড়িয়া অদ্বৈতকে নমস্কার করিয়া পদধূলি লইলেন। ও কহিলেন—

অনুগ্রহ তুমি মোরে কর মহাশয়।
তোমার আমি সে হেন জানিহ নিশ্চয় ॥
ধন্য হইলাম আমি দেখিয়া তোমারে।
তুমি কৃপা করিলে সে কৃষ্ণনাম স্ফুরে ॥
—(চৈঃ ভাঃ—মধ্য, ২য় অঃ)

অদ্বৈত বলিলেন—"সভা হইতে তুমি মোর বড় বিশ্বম্ভর"। আরো বলিলেন—"সর্ব্ব বৈষ্ণবের ইচ্ছা তোমারে দেখিতে। তোমার সহিত কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করিতে ॥" নিমাই স্বীকার করিয়া 'চলিলেন নিজবাসে'।

ইহার ঠিক পরেই অদ্বৈত নবদ্বীপ ছাড়িয়া শান্তিপুর চলিয়া গেলেন। এই ঘটনার পর হঠাৎ তাঁর নবদ্বীপ ছাড়ার কারণ, বৃন্দাবনদাস বলেন—"পরীক্ষিতে চলিলেন শান্তিপুর বাস"।

অদ্বৈতের শান্তিপুরে গমন নিমাইকে পরীক্ষা করিবার জন্য। পূর্ব্ববর্ত্তী নেতা পরবর্ত্তী নেতাকে বিনা পরীক্ষায় কেবল ধূপদীপে আরতি করিয়া নেতৃত্ব ছাড়িয়া দেন নাই। ইহাও অদ্বৈতের অভিপ্রায়—নিমাই যে-বৈষ্ণব সমাজের নেতা হইতে যাইতেছেন, আগে কিছুদিন কীর্ত্তন উপলক্ষে তাঁহাদের সহিত মেলামেশা করুন; তাঁহারাও নিমাইকে দেখুক, নিমাই ও তাঁহাদের দেখুক। ইহা ১৫০৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসের ঘটনা।

ইহার পরে "আরম্ভিলা মহাপ্রভু কীর্ত্তন প্রকাশ"। নিমাই পণ্ডিত খুব আড়ম্বরের সহিত কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। ফল ভাল হইল না। কীর্ত্তনের চীৎকারে পাষণ্ডীরা রাত্রে ঘুমাইতে না-পারিয়া দেয়ানে (রাজদরবারে) খবর দিয়া বৈষ্ণবদের ধরিয়া নিবার জন্য আবেদন জানাইল। তখন নিমাই পণ্ডিত পাষণ্ডী ও যবনরাজ ভয়ে মুহ্যমান নবদ্বীপের বৈষ্ণবদিগকে তাঁহার অবতারত্ব জানাইতে আরম্ভ করিলেন। অবতারের প্রকাশ ক্রমশঃ হইয়া থাকে। শ্রীবাসের বাড়ীতে নিমাই পণ্ডিত একদিন নিজেই শ্রীঅদ্বৈতকে বলিলেন—

> যখন আমার নাহি হয় অবতার।
> আমারে আনিতে শ্রম করিলা অপার॥
>
> —(চৈঃ ভাঃ—মধ্য, ১০ম অঃ)

এই সময় শ্রীপাদ নিত্যানন্দ বৃন্দাবন হইতে নবদ্বীপে আসিয়া নিমাইর সহিত মিলিত হইলেন। নিত্যানন্দ একাদিক্রমে বিশ বৎসর ভারতের তীর্থগুলি ভ্রমণ করিয়া বত্রিশ বৎসর বয়সে নবদ্বীপে আসিলেন। তিনি নিমাই পণ্ডিত অপেক্ষা বয়সে আট বৎসরের বড়।

শ্রীপাদ নিত্যানন্দের নবদ্বীপ আগমন

তীর্থভ্রমণকালে মাধবেন্দ্রপুরীর সহিত নিত্যানন্দের সাক্ষাৎ হয়। মাধবেন্দ্রকে নিত্যানন্দ গুরুর মতন দেখিতেন। সুতরাং নিত্যানন্দ

শ্রীঅদ্বৈতের গুরুভাই। দেখা যাইতেছে যে, প্রাক্‌-চৈতন্য বৈষ্ণব-প্রধানেরা মাধবেন্দ্র হইতেই প্রেরণা পাইতেছেন। কেননা, "গৌরচন্দ্র ইহা কহিয়াছেন বার বার। ভক্তিরসে আদি মাধবেন্দ্র সূত্রধার ॥" নিমাই, নিত্যানন্দ আগমনের পরেই রামাই পণ্ডিতকে শান্তিপুর শ্রীঅদ্বৈতকে আনিবার জন্য পাঠাইলেন। বলিয়া দিলেন, "নির্জ্জনে কহিও নিত্যানন্দ আগমন। যে কিছু দেখিলা তারে কহিও কথন ॥" আরও বলিয়া দিলেন—

আমার পূজার সজ্জ উপহার লৈয়া।
ঝাট আসিবারে বোল সস্ত্রীক হৈয়া ॥

—(চৈঃ ভাঃ—মধ্য, ৬ষ্ঠ অঃ)

রামাই শান্তিপুর গিয়া শ্রীঅদ্বৈতকে বলিলেন—

যাঁর লাগি করিয়াছ বিস্তর ক্রন্দন।
যাঁর লাগি করিলা বিস্তর আরাধন।
যাঁর লাগি করিলা বিস্তর উপাস।
সে প্রভু তোমার লাগি হইলা প্রকাশ।

—(চৈঃ ভাঃ—মধ্য, ৬ষ্ঠ অঃ)

কী সুন্দর বর্ণনা! অদ্বৈত আসিলেন।—

দূরে থাকি দণ্ডবৎ করিতে করিতে।
সস্ত্রীক আইসে স্তব পড়িতে পড়িতে ॥

—(চৈঃ ভাঃ—মধ্য, ৬ষ্ঠ অঃ)

অদ্বৈতের সম্মুখে নিমাইর এক মহা জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ দেখা গেল—"জ্যোতির্ম্ময় বই কিছু নাহি দেখে আর"। গীতার বিশ্বরূপ দর্শনের মত অদ্বৈত জ্যোতির্ম্ময় একটা বিরাট প্রকাশ দেখিলেন। নিমাই বলিলেন—

দেখিয়া জীবের দুঃখ না পারি সহিতে।
আমারে আনিলে সর্ব্ব জীব উদ্ধারিতে ॥

—(চৈঃ ভাঃ—মধ্য, ৬ষ্ঠ অঃ)

পুনঃ পুনঃ বলা হইতেছে, জীব উদ্ধারের জন্যই এই অবতার। সেদিনের নবদ্বীপ, সেদিনের বাংলা তাই বলিয়াছিল—যদিও উড়িষ্যা বা বৃন্দাবন পরে অন্যরকম কথা বলিয়াছে। অদ্বৈত বলিলেন—

মোর কিছু শক্তি নাই, তোমার করুণা।
তোমা বই জীব উদ্ধারিব কোন জনা ?
—(চৈঃ ভাঃ—মধ্য, ৬ষ্ঠ অঃ)

ঐতিহাসিক বিকাশে জীব-উদ্ধারই লীলার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য। ফতেসাহ্ (১৪৮২-১৪৯০ খৃঃ)—মোজাফর সাহ্ (১৪৯৫-১৪৯৯ খৃঃ)—হুসেন সাহ্ (১৪৯৯-১৫২০ খৃঃ, ষ্টুয়ার্ট)-শাসিত বাংলায় ইহা রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজন হইতেই উদ্ভব হইয়াছিল। ইহা সম্পূর্ণ প্রাকৃত, এবং ইতিহাসের পটে প্রত্যক্ষ জীবন্ত চিত্র। এ চিত্র বৃন্দাবনদাস ছাড়া আর কেহ আঁকিতে পারেন নাই। তাঁহারা কথা বলিয়াছেন, ছবি আঁকেন নাই।

অদ্বৈত পুনরায় 'নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় জগদ্ধিতায়' স্তব পড়িলেন। নিমাই 'চরণ তুলিয়া দিল অদ্বৈত মাথায়'।

অদ্বৈতের মাথায় নিমাইর চরণ

কি অসম্ভব কাণ্ড! কিন্তু নিমাই-চরিত্র বিকাশের পথে ইহাতে কোনই অসঙ্গতি দেখা যায় না। বৃন্দাবনদাস যথাযথ বর্ণনাই করিয়াছেন। কেননা, তিনি প্রত্যক্ষদর্শী নিত্যানন্দ ও নিজমাতা নারায়ণীর নিকট শুনিয়া লিখিয়াছেন। নিমাই এখন কৃষ্ণ। অদ্বৈতের মাথায় পা না-দিলে বুঝা যাইত যে, তিনি নিজেকে কৃষ্ণ বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন না। সুতরাং অপরে করিবে কেন ? আবেশের সময় নিমাই নিজেকে কৃষ্ণ অথবা যে-কোন অবতার বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন। তিনি মিথ্যা বলেন নাই। অথবা, কবি মিথ্যা বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন নাই।

তারপর নিমাই অদ্বৈতকে নৃত্য করিতে বলিলেন। নৃত্য উল্লাসের প্রকাশ। অদ্বৈত নাচিলেন—

ক্ষণে বা বিশাল নাচে, ক্ষণে বা মধুর।
ক্ষণে বা দশনে তৃণ করয়ে প্রচুর ॥
ক্ষণে ক্ষণে উঠে, ক্ষণে পড়ি গড়ি যায়।
ক্ষণে ঘন শ্বাস বহে, ক্ষণে মূর্চ্ছা পায় ॥
ধাইয়া ধাইয়া যায়, ঠাকুর পাশে।
নিত্যানন্দ দেখিয়া ভ্রূকুটি করি হাসে ॥

—(চৈঃ ভাঃ—মধ্য, ৬ষ্ঠ অঃ)

নিমাই নিজের গলার মালা অদ্বৈতকে দিয়া বলিলেন : তুমি আমার নিকট বর চাও—"আপন গলার মালা অদ্বৈতেরে দিয়া। বর মাগো বর মাগো বলেন হাসিয়া ॥" অদ্বৈত বলিলেন : আর কী বর চাহিব, আমার চিরতরে যা অভীষ্ট তা সমস্তই পাইলাম। কেননা, আমি "সাক্ষাতে দেখিনু প্রভু তোর অবতার"। ইহাই তো অদ্বৈত এতদিন চাহিয়াছিলেন। তথাপি নিমাই তাহার ভবিষ্যৎ কার্য্য সম্বন্ধে আভাস দিলেন—

ব্রহ্মা ভব নারদাদি যারে তপ করে।
হেন ভক্তি বিলাইমু কহিনু তোমারে ॥

—(চৈঃ ভাঃ—মধ্য, ৬ষ্ঠ অঃ)

অদ্বৈতের নিকট ভবিষ্যৎ-নেতা তাঁহার কর্ম্মপদ্ধতির আভাস দিলেন। অদ্বৈত বলিলেন : শুধু তাতেই হইবে না।—

অদ্বৈত বলয়ে যদি ভক্তি বিলাইবা।
স্ত্রী শূদ্র আদি যত মূর্খেরে সে দিবা ॥
বিদ্যাধন কুল আদি তপস্যার মদে।
তোর ভক্ত তোর ভক্তি যে যে জন বাধে ॥
সে পাপিষ্ঠ সব দেখি মরুক পুড়িয়া।
আচণ্ডাল নাচুক তোর নাম গুণ গাইয়া ॥

—(চৈঃ ভাঃ—মধ্য, ৬ষ্ঠ অঃ)

প্রভু বলিলেন—'সত্য যে তোমার অঙ্গীকার'। বৃন্দাবনদাস বলিতেছেন যে, এই কথার 'সাক্ষী সকল সংসার'। কেননা—

চণ্ডালাদি নাচয়ে প্রভুর গুণগানে।
ভট্ট মিশ্র চক্রবর্ত্তী সবে নিন্দা জানে॥
—(চৈঃ ভাঃ—মধ্য, ৬ষ্ঠ অঃ)

নিমাই-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব-আন্দোলন ব্রাহ্মণদের জন্য হয় নাই। ব্রাহ্মণেরা যেসকল জাতিকে অস্পৃশ্য বলিয়া দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিল, এ আন্দোলন তাদেরই জন্য হইয়াছিল। অকস্মাৎ আকাশ হইতে আন্দোলন নবদ্বীপের মাটিতে পতিত হয় নাই। ইতিহাসের প্রয়োজনে ইহা তিলে তিলে গড়িয়া উঠিয়াছে। যবনরাজ ও ব্রাহ্মণ—এ দুইয়ের নিষ্পেষনে এই আন্দোলন জন্মলাভ করিয়া, একটা বিদ্রোহের আকারে ইতিহাসের পথে তাহার জয়যাত্রা শুরু করিয়াছে। বাঙলার ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দশকের ইতিহাস ও নিমাইয়ের অদ্ভুত নবদ্বীপলীলা, ইহার সাক্ষী।

শ্রীবাসের বাড়ীতে নিমাইয়ের অভিষেক

তারপর শ্রীবাসের বাড়ীতে নিমাইয়ের খুব আড়ম্বর করিয়া অভিষেক হইল। ইহা, সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁহার নেতৃত্ব গ্রহণ—"নিত্যানন্দ মহাপ্রভু শিরে ধরে ছাতি। জোর করে অদ্বৈত সম্মুখে করে স্তুতি॥" নিমাই বলিলেন: আমার অভিষেক-গীত গাও। 'গাওয়া হইল।

চন্দ্রশেখর-ভবনে নাটকাভিনয়ে মহাপ্রভু রুক্মিণীবেশে নৃত্য করিলেন। এই নাটকাভিনয়ের পর অদ্বৈত আবার শান্তিপুর চলিয়া গেলেন। অদ্বৈতের প্রতি নিমাইয়ের গুরুবুদ্ধি দূর হয় না—মাথায় পা দিলে কী হইবে। ইহাই অদ্বৈতের আক্ষেপ। অদ্বৈত শান্তিপুর গিয়া আবার জ্ঞানপথে শাস্ত্রব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। ইহাও নিমাইকে পরীক্ষা করিবার জন্য। জ্ঞানপথ ছাড়িয়া ভক্তিপথে প্রচার করিতে হইবে—ইহাই প্রয়োজন ও সিদ্ধান্ত। ইহা জানিয়াও অদ্বৈত বিরুদ্ধাচরণ আরম্ভ করিলেন। নিমাই বুঝিতে পারিয়া আবার শান্তিপুর আসিলেন।—

মোহেরে আনিল নাঢ়া শয়ন ভাঙ্গিয়া।
এখনে বাখানে জ্ঞান ভক্তি লুকাইয়া॥
—(চৈঃ ভাঃ—মধ্য, ১৯শ অঃ)

নিমাই অদ্বৈতকে জিজ্ঞাসা করিলেন—জ্ঞান বড়, কি ভক্তি বড় অদ্বৈত বলিলেন—জ্ঞান বড়। আর যাবে কোথায়!—

পিড়া হইতে অদ্বৈতেরে ধরিয়া আনিয়া।
স্বহস্তে কিলায় প্রভু উঠানে পাড়িয়া॥

অদ্বৈতগৃহিণী চীৎকার করিয়া বলিলেন—

বুড়া বিপ্র বুড়া বিপ্র রাখ রাখ প্রাণ।
কাহার শিক্ষায় কর এত অপমান॥
—(চৈঃ ভাঃ—মধ্য, ১৯শ অঃ)

ভক্তি ছাড়িয়া জ্ঞান চর্চ্চায় অদ্বৈতের এই শাস্তি। অদ্বৈত ভক্ত, কিন্তু জ্ঞানী ভক্ত; অজ্ঞানী ভক্ত নহেন। কেননা, ইচ্ছামাত্রই তিনি ভক্তি ছাড়িয়া জ্ঞানপথে ব্যাখ্যা করিতে পারেন। ইহা প্রণিধানযোগ্য।

আবেশ-ভাবের নিমাই-চরিত্রের সহিত এই ঘটনা কিছুমাত্র অসংলগ্ন বা অসঙ্গত হয় নাই। তারপর নিমাই বলিলেন—

আরে আরে কংস যে মারিল সেই মুঞি।
—(চৈঃ ভাঃ—মধ্য, ১৯শ অঃ)

অদ্বৈত সুন্দর উত্তর দিলেন। বলিলেন: আমি দুর্ব্বাসাও নহি যে শাপ দিব, আর ভৃগুও নহি যে তোমার বুকে লাথি মারিব। "মোর নাম অদ্বৈত, তোমার শুদ্ধ দাস।"

অদ্বৈত-চরিত্র বিকাশের জন্য এ-প্রহারের প্রয়োজন ছিল। অথচ ভক্তিপথে শাস্ত্র ব্যাখ্যায় বাঙলায় আচার্য্য অদ্বৈত, যেমন দাক্ষিণাত্যে ছিলেন রামানুজ। তারপরে—

অদ্বৈত কান্দয়ে দুই চরণ ধরিয়া।
প্রভু কান্দে অদ্বৈতেরে কোলেতে করিয়া॥
—(চৈঃ ভাঃ—মধ্য, ১৯শ অঃ)

নিমাই অদ্বৈতকে লইয়া নবদ্বীপ ফিরিয়া আসিলেন।

১৫০৯ খৃষ্টাব্দে নিমাই পণ্ডিত শ্রীঅদ্বৈতের কথামত নির্ব্বিঘ্নে আচণ্ডালে হরিনাম বিলাইতে পারেন নাই। গৌড়েশ্বর যবনরাজ এবং তাহার উৎসাহী কর্ম্মচারিবৃন্দ ইহাতে বাধা দিয়াছিল। পাষণ্ডীরা ষড়যন্ত্র করিয়া কাজীকে সংবাদ দিল যে—নিমাই পণ্ডিত আমাদের হিন্দুধর্ম্ম সমস্ত নষ্ট করিল, তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া শায়েস্তা কর। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—"একদিন দৈবে কাজী সেই পথে যায়। মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ শুনিবারে পায়॥ কাজী বলে ধর ধর আজি কর কার্য্য। আজি বা কী করে তোর নিমাই আচার্য্য॥ যাহারে পাইল কাজী মারিল তাহারে। ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ অনাচার কৈল দ্বারে॥"

অতএব, চাঁদ কাজীর বাড়ী আক্রমণের কারণ অতিশয় সুস্পষ্ট। বৈষ্ণবেরা আসিয়া নিমাই পণ্ডিতকে বলিল: "নবদ্বীপ ছাড়িয়া যাইব অন্য স্থানে"। নিমাই সম্পূর্ণ উল্টা কথা বলিলেন।—

প্রভু বলেন নিত্যানন্দ হও সাবধান।
এই ক্ষণে চল সব বৈষ্ণবের স্থান॥
সর্ব্ব নবদ্বীপে আজি করিমু কীর্ত্তন।
দেখি মোরে কোন কর্ম্ম করে কোন জন॥
দেখ আজি কাজীর পোড়াও ঘর দ্বার।
কোন কর্ম্ম করে দেখি রাজা বা তাহার॥

—(চৈঃ ভাঃ—মধ্য, ২৩শ অঃ)

ঠিক হইল যে—"আগে নৃত্য করিবেন আচার্য্য গোসাঞি"। তাঁহাকে ঘিরিয়াও এক সম্প্রদায় গাইবেন। মধ্যে নৃত্য করিবেন হরিদাস। তাঁহাকে ঘিরিয়াও এক সম্প্রদায় গাইবেন। "তবে নৃত্য করিবেন শ্রীবাস পণ্ডিত।" তাঁহাকে ঘিরিয়াও এক সম্প্রদায় গাইবেন। "সকল পশ্চাতে প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর—নিত্যানন্দ গদাধর যার দুই পাশে।"

চাঁদ কাজীর বাড়ী লুণ্ঠনে সর্ব্বাগ্রে শ্রীঅদ্বৈত

আচার্য্য অদ্বৈত এই স্মরণীয় অভিযানের সর্ব্বাগ্রে, পুরোভাগে।

আর ঠিক তার পশ্চাতেই যবন হরিদাস—যিনি যবনরাজ কর্তৃক বাইশবাজারে চাবুকের আঘাত সহ্য করিয়া বৈষ্ণব-আন্দোলনের প্রথম শহীদ। শ্রীঅদ্বৈতের বয়স তখন ৭৫ এবং হরিদাসের বয়স তখন ৬০ বৎসর। আর নেতৃত্ব করিতেছেন যে তেজস্বী যুবক, তাঁর বয়স ২৪ বৎসরও পূর্ণ হয় নাই।

নিমাইয়ের সন্ন্যাস গ্রহণ

নিমাই পণ্ডিত গয়া গিয়া মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ঈশ্বর পুরীর নিকট দশ অক্ষর গোপীমন্ত্রে দীক্ষা লইয়াছিলেন। এইবার তিনি কাটোয়ায় গিয়া কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাসগ্রহণে কৃতসংকল্প হইলেন। ভক্তেরা সকলেই আপত্তি করিলেন। শচীমাতা, বিষ্ণুপ্রিয়ার তো কথাই নাই। গদাধর পণ্ডিত নিমাইকে বলিলেন, "তোমার যে মত বেদের সে মত নহে"—ইহা অশাস্ত্রীয়। 'তোমার মত'-এ কি গৃহস্থ বৈষ্ণব নাই? শ্রীঅদ্বৈত শ্রীবাসাদি সকলেই তো গৃহী বৈষ্ণব। সন্ন্যাসী কেহই নহে। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ হ্যাঁ-না, কিছুই

শ্রীঅদ্বৈত সমর্থন করিলেন না

বলিলেন না। শুধু বলিলেন—তুমি জীবোদ্ধার করিবে, যেরূপ করিলে ভাল হয় তাই কর। সবচেয়ে গুরুতর কথা বলিলেন—শ্রীঅদ্বৈত। তিনি বলিলেন—"ঈশ্বরে বৈরাগ্য কেন করে"? যিনি শ্রীকৃষ্ণের অবতার, সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন—তাঁহার সন্ন্যাস কী প্রয়োজন! নিমাই পণ্ডিত কাহারও

'ঈশ্বরে বৈরাগ্য কেন করে'

নিষেধ মানিলেন না। সোজা কাটোয়ায় গিয়া কেশব ভারতীর নিকট শাঙ্কর বেদান্ত মতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এই সন্ন্যাস গ্রহণের সময় আচার্য্য অদ্বৈত উপস্থিত ছিলেন না।

নিমাই নিত্যানন্দকে গোপনে বলিয়াছিলেন যে—আচার্য্য গোসাঞি (অদ্বৈত) এই সন্ন্যাসের বিরোধী, অতএব তাঁহার নিকট ইহা সংগোপনে রাখিও।

আচার্য্য গোসাঞিঃর বিরোধ সঙ্গোপে রহিল।

—(জয়ানন্দ, চৈঃ মঃ—সন্ন্যাস খণ্ড)

"শুনি মূর্চ্ছা গেল তবে অদ্বৈত গোসাঞি" ; হরিদাস ঠাকুর 'শুনি লাগিল সমাধি'।—অতি সুন্দর চরিত্রাঙ্কন হইয়াছে।

সন্ন্যাসের সময় নিমাই পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম গ্রহণ করিলেন। কাটোয়া হইতে সন্ন্যাসী নিমাই গেরুয়া বসন পরিধান করিয়া এক হাতে দণ্ড, আরেক হাতে কমণ্ডলু লইয়া প্রথমে হরিদাসের ফুলিয়া আসিলেন। 'ফুলিয়া নগরে প্রভু আছেন শুনিয়া', অনন্ত অর্ব্বুদ লোক খেয়াঘাটে পার হইয়া, কতবা নৌকাডুবি হইয়া, 'হইতে লাগিল বড় লোকের গহন। ফুলিয়া পুড়িল তবে নগর কানন।' তারপরে চলিলেন শান্তিপুরে আচার্য্যের ঘরে। শ্রীঅদ্বৈতের সহিত মিলিত হইলেন। শচীমাতাকে আনা হইল। বিষ্ণুপ্রিয়াকে আনা হইল না। শচীমাতা ১২ দিন উপবাস করিয়াছেন। "দ্বাদশ উপাসে আই করিলা ভোজন।" হরিদাস ঠাকুরকে 'আগু হবিষ্যান্ন দিলা'। শ্রীচৈতন্য ভক্তদের বলিলেন—'যদ্যপি সহসা আমি করিয়াছি সন্ন্যাস ; তথাপি তোমা সব না ছাড়িব যাবৎ আমি জীব।' শচীমাতার সহিত পরামর্শ করিয়া শ্রীচৈতন্য নীলাচলে যাওয়া স্থির করিলেন।

১৫১০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে মাঘ (ফেব্রুয়ারী, ২য় সপ্তাহ) প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য কাটোয়া যাত্রা করিলেন। ২৯শে মাঘ সংক্রান্তির দিন প্রাতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। ১২ই ফাল্গুন নীলাচলে রওনা হইলেন। ফাল্গুনে আসিয়া 'কৈল নীলাচলে বাস'। ফাল্গুনের শেষে দোলযাত্রা সে দেখিল।

ফাল্গুনে নীলাচলে আসিয়া পরবর্ত্তী ৭ই বৈশাখ শ্রীচৈতন্য দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। গোদাবরীতীরে রায় রামানন্দের সহিত মিলিত হইলেন। রামানন্দের সহিত কৃষ্ণকথা, রসতত্ত্বের ব্যাখ্যা, অনেক হইল। রায় চৈতন্য অবতারের নূতন ব্যাখ্যা দিলেন। নবদ্বীপে আচার্য্য অদ্বৈত শ্রীচৈতন্যকে কৃষ্ণের অবতার করিয়াছিলেন। উড্রদেশে

শ্রীঅদ্বৈত ও রামানন্দ

গোদাবরীতীরে রায় রামানন্দ তাহার উপর রাধিকার অবতার আরোপ করিলেন। অবতার—কৃষ্ণ হইতে রাধিকার দিকে মুখ ফিরাইলেন। রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ নিজরস আস্বাদন করিবার জন্য অবতার হইয়াছেন। অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য রস আস্বাদন, জীব উদ্ধার নহে।—ইহা আচার্য্য অদ্বৈত কোথাও কহেন নাই। শ্রীঅদ্বৈতে চৈতন্যলীলার যে উদ্দেশ্য পাই, পুরী-লীলায় রামানন্দ রায় তাহা উল্টাইয়া দিলেন। সংকীর্ত্তন আরম্ভে 'মোহার অবতার', 'দুষ্ট বিনাশিমু, সাধু উদ্ধারিমু'—নীলাচলে রাধাভাবে ভাবিত হইয়া অবতার আর এ-কথা বলেন না। ১৫২১ খৃষ্টাব্দ হইতেই মহাপ্রভুর দ্বাদশ বর্ষব্যাপী দিব্যোন্মাদ আরম্ভ হয়। এই দিব্যোন্মাদের মাঝামাঝি সময়ে (১৫২৮ খৃঃ) আচার্য্য অদ্বৈত শান্তিপুরে থাকিয়া প্রভুকে নীলাচলে জগদানন্দের নিকট এক তরজা প্রহেলী কহিয়া বা লিখিয়া পাঠাইলেন। এই তরজার অর্থ সহজে বোধগম্য নয়। আচার্য্য অদ্বৈত বলিতেছেন—

তরজা প্রহেলিকা

প্রভুকে কহিয় আমার কোটি নমস্কার।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার ॥
বাউলকে কহিও লোকে হৈল আউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল ॥
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল ॥
এত শুনি জগদানন্দ হাসিতে লাগিলা।
নীলাচলে আসি তবে প্রভুকে কহিলা ॥
তরজা শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিলা।
তাঁর যেই আজ্ঞা বলি মৌন করিলা ॥
জানিয়া স্বরূপ গোসাঞি প্রভুকে পুছিল।
এই তরজার অর্থ বুঝিতে নারিল ॥
প্রভু কহে আচার্য্য হয় পূজক প্রবল।
আগম শাস্ত্রের বিধি বিধানে কুশল ॥

উপাসনা লাগি দেবে করে আবাহন।
পূজা লাগি কতক কাল করে নিরোধন॥
পূজা নির্ব্বাহ হইলে পাছে করে বিসর্জ্জন।
তরজার না জানি অর্থ কিবা তার মন॥
মহাযোগেশ্বর আচার্য্য তরজাতে সমর্থ।
আমিহ বুঝিতে নারি তরজার অর্থ॥
শুনিয়া বিস্মিত হৈলা সব ভক্তগণ।
স্বরূপ গোঁসাঞি কিছু হৈলা বিমন॥
সেইদিন হইতে প্রভু আর দশা হইল।
কৃষ্ণবিরহ দশা দ্বিগুণ বাড়িল॥
উন্মাদ প্রলাপ চেষ্টা করে রাত্রিদিনে।
রাধা-ভাবাবেশে বিরহ বাড়ে অনুক্ষণে॥

—(চৈঃ চঃ—অন্ত্য, ১৯শ পঃ)

প্রভু বলিতেছেন—এই তরজার অর্থ তিনি বুঝিতে পারেন না। অথচ আচার্য্য অদ্বৈতের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া মৌন অবলম্বন করিলেন। কাজেই মনে হয়, তিনি অর্থ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তবে সাধারণে প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নহেন। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—'প্রভু মাত্রে বুঝে, কেহ বুঝিতে না পারে।' যদি তিনি বুঝিতেই না-পারিবেন, তবে তাঁহার দিব্যোন্মাদ দ্বিগুণ বাড়িল কেন?

মহাপ্রভু ১৫১৬ খৃষ্টাব্দ হইতে শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে গৌড়দেশে প্রচার করিতে প্রেরণ করেন। শ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রচারের দ্বাদশ বৎসর পরে আচার্য্য অদ্বৈত মহাপ্রভুকে এই তরজা প্রেরণ করেন। কেহ কেহ মনে করেন, শ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রচারের বিরুদ্ধে আচার্য্য অদ্বৈত এই তরজা প্রেরণ করিয়াছিলেন।

শ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রচার

'লোকে হৈল আউল', 'হাটে না বিকায় চাউল', 'কাজে নাহিক আউল', ইত্যাদি কথায় শ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রচারের বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল, ইহা তাহারই প্রতি কটাক্ষ। কিন্তু এই ব্যাখ্যাও অনুমান-

সঙ্গত মনে হয় না। এই জন্য যে, শ্রীবাসের বাড়ীতে মহাপ্রভুর নেতৃত্বগ্রহণরূপ অভিষেকের সময় আচার্য্য অদ্বৈত মহাপ্রভুকে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন—"যদি ভক্তি বিলাইবা ; স্ত্রী শূদ্র মুর্খ আদি তাদেরে সে দিবা। চণ্ডাল নাচুক তোর নাম গুণ গাইয়া ; প্রভু বলে সত্য যে তোমার অঙ্গীকার।"—(চৈঃ ভাঃ—৬ষ্ঠ অঃ)।

আচার্য্য অদ্বৈতের আদেশ অনুযায়ী শ্রীপাদ নিত্যানন্দ আচণ্ডালে মহাপ্রভুর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন। সুতরাং নিত্যানন্দের প্রচারের বিরুদ্ধে এই তরজায় আচার্য্য অদ্বৈতের কটাক্ষ অনুমান করা ইতিহাসসম্মতও নয়, এবং যুক্তিসিদ্ধও নয়।

কিন্তু এই তরজাতে আঘাত পাইবার মত এমন কিছু ছিল—নিশ্চয়ই ছিল—যাহাতে এই তরজা পাইয়া মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল।

তরজার প্রচলিত অর্থ হইতেছে যে, অদ্বৈত মহাপ্রভুকে বলিলেন : এখন তুমি লীলা সংবরণ কর ; কেননা, লীলার যে প্রয়োজন, তাহা শেষ হইয়াছে। কিন্তু একথা আচার্য্য অদ্বৈত মহাপ্রভুকে বলিতে পারেন বলিয়া আমার ধারণা হয় না। আমার ধারণা—নিত্যানন্দের প্রচারের বিরুদ্ধে যে একটা প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়াছিল, সেই প্রতিক্রিয়ার সহিত এই তরজা প্রহেলিকার একটা যোগাযোগ আছে। শ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রচারের বিরুদ্ধে মহাপ্রভুর নিকটেই লাগানি হইয়াছিল। মহাপ্রভু শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে বলিয়াছিলেন যে—"মহোৎসব মাগিয়া নাচেন সংকীর্ত্তনে ; হেন যুক্তি তোমারে দিলেক কোন জনে।"—(জয়ানন্দ, চৈঃ মঃ—উত্তর খণ্ড)।

শ্রীপাদ উত্তর করিলেন—'কাঠিন্য কীর্ত্তন কলিযুগধর্ম্ম নহে'। শ্রীপাদের প্রচার লইয়া যে কিছুটা তর্কবিতর্ক মহাপ্রভুর সহিত হইয়াছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেল। এই দিক দিয়া শ্রীঅদ্বৈতের তরজার সহিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রচারের একটা যোগাযোগ থাকা অসম্ভব তো নয়ই, বরং খুব সম্ভব।

মহাপ্রভু ১৫৩৩ ২৯শে জুন লীলা সংবরণ করেন।

বৃন্দাবনদাস অথবা কবিরাজ গোস্বামী মহাপ্রভুর তিরোভাব সম্পর্কে একেবারে নীরব। ইহা অতীব শোকাবহ ঘটনা বলিয়াই হয়তো তাঁহারা নীরব। অথবা অন্য কারণও থাকিতে পারে। জয়ানন্দ লিখিয়াছেন—

মহাপ্রভুর তিরোভাব

আষাঢ় বঞ্চিত রথ বিজয় নাচিতে।
ইটাল বাজিল বাম পায়ে আচম্বিতে॥
সেই লক্ষ্য টোটায় শয়ন অবশেষে।
—(চৈঃ মঃ—উত্তর খণ্ড)

লোচন লিখিয়াছেন—

আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে॥
তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে॥
—(চৈঃ মঃ—শেষ খণ্ড)

মহাপ্রভুর তিরোভাব রহস্যে আবৃত। আচার্য্য অদ্বৈত, মহাপ্রভুর তিরোভাবের পরেও কয়েক বৎসর জীবিত ছিলেন।

ঠাকুর হরিদাস

[জন্ম—১৪৫০ খ্বঃ ॥ মৃত্যু—১৫৩০ খ্বঃ ॥ ৮০ বৎসর]

॥ ঠাকুর হরিদাস ॥

"হরিদাস আছিল পৃথিবীর শিরোমণি।
তাহা বিনা রত্নশূন্য হইল মেদিনী॥
*　　　*　　　*
উজ্জ্বলা মায়ের নাম, বাপ মনোহর।"

কোন কোন উৎসাহী হিন্দু মনোহরের পশ্চাতে চক্রবর্ত্তী যোগ করিয়া হরিদাসকে ব্রাহ্মণকুমার প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যে অসাম্প্রদায়িক উদারতা হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের আবির্ভাব, পুনরায় তাহাকে সাম্প্রদায়িকতার গহ্বরে টানিয়া আনিবার জন্য পরবর্ত্তীয়দের এই অপপ্রয়াস। হরিদাস কিন্তু সর্ব্বদাই 'ম্লেচ্ছাধম' বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন।

জন্ম

বর্ত্তমান খুলনা জেলার অন্তর্গত বূঢ়ন পরগণায় সোনাই নদীর তীরে ভাটকলাগাছি গ্রামে অনুমান ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে হরিদাসের জন্ম হয়। তাঁহার মুসলমানি নাম অজ্ঞাত।

বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—'বূঢ়ন গ্রামেতে অবতীর্ণ হরিদাস'। —(চৈঃ ভাঃ, পৃঃ ১১৮)। জয়ানন্দ বলেন—"স্বর্ণ-নদী তীরে ভাটকলাগাছি গ্রাম, হীন কুলে জন্ম হয় উপরি পূর্ব্ব নাম।" জয়ানন্দও বূঢ়নের কথা বলেন—"বূঢ়ন হইতে আইলা হরিদাস।" জয়ানন্দ, বৃন্দাবনদাসের পরে গ্রন্থ লিখিয়াছেন। সম্ভবতঃ বৃন্দাবনদাসকে কিছুটা সংশোধন করিয়াই জয়ানন্দ লিখিয়াছেন যে—সোনাই নদী তীরে ভাটকলাগাছি গ্রামেই হরিদাসের জন্ম হয়। বূঢ়ন একটি পরগণা—গ্রাম নহে।

১৮ বৎসর বয়সে হরিদাস 'গৃহ ত্যাগ কৈলা' এবং 'বহু স্থান

ভ্রমিয়া' শান্তিপুরে "শ্রীঅদ্বৈত স্থানে আসি হইলা উদয়, আজানু লম্বিত বাহু তেজঃপুঞ্জ কায়।" আচার্য্য অদ্বৈত জিজ্ঞাসা করিলেন: "তুমি কোন জাতি? ইহা আইলা কিবা আশে?"

শান্তিপুরে অদ্বৈতের সহিত মিলন

হরিদাস কহিলেন, 'মুঞি ম্লেচ্ছাধম'; তোমার চরণ দর্শন করিতে আসিয়াছি। আচার্য্য অদ্বৈত কহিলেন—"ইহা রহি করহ বিশ্রাম। ধর্ম্মশাস্ত্র পড়, সিদ্ধ হইব মনস্কাম॥"

তবে হরিদাস প্রভু অদ্বৈতের স্থানে।
ব্যাকরণ সাহিত্যাদি পড়িলা যতনে॥
ক্রমে দর্শনাদি পড়ি হইয়া ব্যুৎপত্তি।
শ্রীমদ্ভাগবত পড়ি পাইলা শুদ্ধভক্তি॥

—(ঈঃ নাঃ—পৃঃ ৭১)

তারপর অদ্বৈত বলিলেন—"ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হেতু লহ হরিনাম; নাম ব্রহ্ম প্রচারিয়া জীবে কর ত্রাণ। নামে নিষ্ঠা হইলে হয় প্রেম উদ্দীপন; অতএব নাম ব্রহ্ম গ্রহণ উত্তম।"

এত কহি তার মস্তকাদি মুণ্ডাইয়া।
তিলক তুলসী মালা দিলা পরাইয়া॥
কটিতে কৌপীনডোর দিলেন বান্ধিয়া।
হরিনাম দিলা প্রভু শক্তি সঞ্চারিয়া॥
গঙ্গার গহ্বরে পাঞা নাম চিন্তামণি।
প্রেমেতে মাতিলা শ্রীবৈষ্ণবচূড়ামণি॥

হরিদাসের মস্তক মুণ্ডন ও বৈষ্ণববেশ ধারণ

—(ঈঃ নাঃ)

বৈষ্ণবচূড়ামণি অর্থ—যবন হরিদাস। শ্রীঅদ্বৈত তাঁহার নাম রাখিলেন—ব্রহ্ম হরিদাস। "তবে তিঁহো দৈন্যবেশ করিয়া ধারণ তিন লক্ষ নাম জপের করিলা নিয়ম।"

কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন, হরিদাস শান্তিপুরে আসিয়া—

আচার্য্য মিলিয়া কৈল দণ্ডবৎ প্রণাম।
অদ্বৈত আলিঙ্গন করি, করিল সম্মান॥

গঙ্গাতীরে গোঁফা করি, নির্জ্জনে তারে দিল।
ভাগবৎ গীতার ভক্তি অর্থ শুনাইল ॥
আচার্য্যের ঘরে নিত্য ভিক্ষা নির্ব্বাহন।
দুই জনে মিলি কৃষ্ণকথা আস্বাদন ॥
—(চৈঃ চঃ)

শ্রীঅদ্বৈতের উপাধি বেদপঞ্চানন। তিনি মহাপণ্ডিত। বাড়ীতে টোল আছে। ছাত্রদের শাস্ত্র পড়ান। বড় ব্রাহ্মণ। তিনি একজন মুসলমানকে এইভাবে সম্মান দিলেন, অন্তরঙ্গ শিষ্য এবং বন্ধুর মত গ্রহণ করিলেন—শান্তিপুরে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে নিঃসন্দেহে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল।

বৃন্দাবনদাস হরিদাস সম্পর্কে লিখিয়াছেন—"আজানু লম্বিত ভুজ কমল নয়ন; সর্ব্ব মনোহর, মুখচন্দ্র অনুপম।"—(চৈঃ ভাঃ)। ঈশাননাগর আজানুলম্বিত ভুজের কথাই লিখিয়াছেন, এবং তিনি প্রত্যক্ষদর্শী। হরিদাসের রূপবর্ণনা পাঠ করিয়া তাঁহাকে পাঠান বলিয়াই মনে হয়। মোগল তখনও ভারতবর্ষে আসে নাই। বাবর তখনও দিল্লী আক্রমণ করেন নাই। সেকান্দর লোদী তখন দিল্লীর সিংহাসনে। গৌড়ের সিংহাসনে তখন হুসেন শাহ। উভয়েই পাঠান।

একদিন হরিদাস শ্রীঅদ্বৈতকে বলিলেন—

অহে প্রভু আজ্ঞা দেহ যাঙ্ বিরলেতে।
অবিশ্রান্ত হরিনামামৃত আস্বাদিতে ॥
—(ঈঃ নাঃ)

হরিদাস স্বভাববৈরাগী। তিনি বেনাপোলের গভীর অরণ্য-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

হরিদাস যবে নিজ গৃহ ত্যাগ কৈলা।
বেনাপোলের বনমধ্যে কতদিন রহিলা ॥

নির্জ্জন বনে কুটির করি তুলসী সেবন।
রাত্রি দিনে তিন লক্ষ নাম সংকীর্ত্তন॥

—(চৈঃ চঃ—পৃঃ ৩২৮)

এইরূপে তিনি সকলের পূজনীয় হইয়াছিলেন। "প্রভাবে সকল লোক করয়ে পূজন।"—(চৈঃ চঃ—পৃঃ ৩২৮)।

ঈশাননাগর লিখিয়াছেন—

লক্ষহীরা বেশ্যার উদ্ধার

একদিন বেশ্যা এক রূপে বিদ্যাধরি।
হরিদাস পাশে আইলা বেশভূষা করি॥
কুটির দ্বারেতে বসি অঙ্গভঙ্গী করে।
হরিদাস মিষ্ট বাক্য পুছিলা তাহারে॥
সন্ধ্যাকালে আইলা ইহা কিবা প্রয়োজন।
বেশ্যা কহে তোঁহে দেখি মুগ্ধ হৈল মন॥
অপরূপ রূপ তোঁহার নবীন যৌবন।
সুখভোগ কর ছাড়ি নাম সংকীর্ত্তন॥

—(ঈঃ নাঃ—পৃঃ ৯৩)

এই বেশ্যার নাম হীরা বা লক্ষহীরা।

প্রাক্-চৈতন্য যুগে বড় বড় লোক যে সবই বৈষ্ণব ছিলেন, তা নয়। বৈষ্ণববিদ্বেষীও তাঁদের মধ্যে অনেকে ছিলেন। রামচন্দ্র খান এইরূপ একজন বৈষ্ণব-বিদ্বেষী সম্ভ্রান্ত লোক। তাঁহার প্রকৃত ব্যবসা ডাকাতি করা। অনেক বড়লোকে তখন ডাকাতি করিত। সেই সময়ে তাঁর প্রতাপের আরেকটা বড় পরিচয় যে—তিনি রাজাকে কর দিতেন না। "দস্যুবৃত্তি রামচন্দ্রের, রাজায় না দেয় কর।" তার অর্থ, তিনি গৌড়াধিপ (হুসেন শাহ্)-কে কর দিতেন না। রামচন্দ্র খাঁ বারনারীদিগকে ডাকিয়া আনিয়া হুকুম দিলেন—তোমরা এই হরিদাসের ধর্ম্ম নষ্ট কর। বারনারীগণের মধ্যে একজন অতি সুন্দরী যুবতী তিনদিনের মধ্যে এই কার্য্য সম্পন্ন করিবেন প্রতিশ্রুতি দিয়া অগ্রসর হইলেন। রাত্রিকালে সেই বারনারী উত্তম সজ্জা করিয়া হরিদাসের গোঁফার নিকটে গেলেন। দুয়ারে বসিয়া

গা খুলিয়া স্তন দেখাইতে লাগিলেন। "অঙ্গ উঘারিয়া দেখায় বসিয়া দুয়ারে।" মধুর স্বরে সেই বেশ্যা বলিলেন—"ঠাকুর তুমি পরম সুন্দর; প্রথম যৌবনে তোমার সঙ্গম লাগি লুব্ধ মোর মন।" —(চৈঃ চঃ—অন্ত্য, ৩য় পঃ)। এই বলিয়া সেই বেশ্যা আত্ম-নিবেদন করিলেন।

হরিদাস বলিলেনঃ আচ্ছা আমার সংখ্যা নাম জপ শেষ হউক। "তাবৎ তুমি বসি শুন নাম সংকীর্ত্তন।" দুইদিন এইরূপ কাটিল। তৃতীয় দিনে, "কীর্ত্তন করিতে ঐছে রাত্রি শেষ হইল। ঠাকুরের সনে বেশ্যার মন ফিরি গেল॥"

বেশ্যা রামচন্দ্র খানের ষড়যন্ত্রের কথা বলিলেন, এবং উদ্ধার প্রার্থনা করিলেন। "বেশ্যা হইয়া মুঞি পাপ করেছি অপার। কৃপা করি কর মো অধমের নিস্তার॥"—(চৈঃ চঃ—অন্ত্য, ৩য় পঃ)। হরিদাস বলিলেন—খানের কথা আমি আগেই জানিতাম। আহা! সে অজ্ঞ, মূর্খ। প্রথম যেদিন তুমি আসিয়াছিলে, সেইদিনই আমি এস্থান ত্যাগ করিয়া যাইতাম। কেবল তোমার জন্যই তিন দিন রহিয়া গেলাম।—

ঠাকুর কহে খানের কথা সব আমি জানি।
অজ্ঞ মূর্খ সেই তারে দুঃখ নাহি মানি॥
সেইদিন যাইতাম এস্থান ছাড়িয়া।
তিন দিন রহিলাম তোমার লাগিয়া॥

—(চৈঃ চঃ—অন্ত্য, ৩য় পঃ)

বেশ্যার উদ্ধারের জন্য ঠাকুর হরিদাস তিন দিন থাকিয়া গেলেন। ইহার পর ১৫১০ খৃষ্টাব্দে মহাপ্রভু সন্ন্যাস লইয়া দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ-কালে সত্যবাঈ, লক্ষ্মীবাঈ, বারমুখী (বেশ্যা), মুরারী পল্লীর দেবদাসী (বেশ্যা) প্রভৃতিকে বৈষ্ণব ধর্ম্ম দিয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন। —(গোবিন্দের কড়চা ও চৈতন্যচরিতামৃত উল্লেখযোগ্য)। ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব ধর্ম্মে পতিত ও পতিতার উদ্ধার একটা বৈশিষ্ট্য।

এবং এই কার্য্যে যবন হরিদাস—মহাপ্রভু ও শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুর অগ্রগামী ও অগ্রণী। সেদিন ইহা কত বড় সাহসের কাজ ছিল! হরিদাস বলিলেন—

ঘরের দ্রব্য ব্রাহ্মণে কর দান।
এই ঘরে আসি তুমি করহ বিশ্রাম।
নিরন্তর নাম কর তুলসী সেবন।
অচিরেতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ।

—(চৈঃ চঃ—অন্ত্য, ৩য় পঃ)

হরিদাস সেখান হইতে চলিয়া চাঁদপুরে আসিলেন। আশ্চর্য্য এই যে, সেই বেশ্যাও প্রতিদিন তিন লক্ষ নাম জপের অধিকারিণী হইয়াছিলেন। ইতিহাসের অনেক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবও ইহা সেকাল বা একালে পারেন নাই।—

সেই বেশ্যা 'প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হৈলা পরম মোহান্তি'

মাথা মুড়ি এক বস্ত্রে রৈলা সেই ঘরে।
রাত্রি দিনে তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করে॥
প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হৈলা পরম মোহান্তী।
বড় বড় বৈষ্ণব তার দর্শনেতে যান্তি॥
বেশ্যার চরিত্র দেখি লোক চমৎকার।
হরিদাসের মহিমা কহে করি নমস্কার॥

—(চৈঃ চঃ—অন্ত্য, ৩য় পঃ)

আমরাও হরিদাসের মহিমা কহিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে করযোড়ে নমস্কার করিতেছি।

চাঁন্দপুরে মুলুকের মজুমদার হিরণ্য গোবর্দ্ধন। তাঁর পুরোহিত বলরাম; আচার্য্যের গৃহে খাইতেন আর নির্জ্জন পর্ণশালায় বসিয়া নাম জপ করিতেন। হিরণ্য গোবর্দ্ধন পণ্ডিতলোক। তাঁহার সভায় অনেক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ আছেন। বলরাম একদিন মিনতি করিয়া হরিদাসকে তাঁহাদের সভায় নিয়া গেলেন। নাম জপ সম্বন্ধে কথা হয়। কেহ বলিল—নামে পাপ ক্ষয় হয়। কেহ বলিল—

মোক্ষ হয়। হরিদাস অস্বীকার করিলেন। তিনি নাম জপের নূতন ব্যাখ্যা দিলেন।—

নাম জপের ফল কী

হরিদাস কহে নামের এ দুই ফল নয়।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়॥
—(চৈঃ চঃ—পৃঃ ৩৩০)

পাপক্ষয় মহাপ্রভুর ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। মোক্ষ ত বৈষ্ণব লইবেন না।—

নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়।
—(চৈঃ চঃ)

ইহা শাঙ্কর বেদান্তের স্পষ্ট প্রতিবাদ। প্রেমই বাঙালী বৈষ্ণবের সাধ্য, অর্থাৎ সাধনার বস্তু। প্রেমকেই সাধন করিতে হইবে। প্রেমই ধর্ম্ম। সুতরাং নামের ফল—প্রেম। —হরিদাসের এই নূতন ব্যাখ্যা মহাপ্রভুর পূর্ব্বগামী, এবং পরে নিশ্চয়ই তাঁহার অনুমোদিত। মহাপ্রভু যাহা পরে করিবেন, হরিদাসে তাহার পূর্ব্বাভাস আমরা পাইতেছি। এইখানে হরিদাস-চরিত্রের গুরুত্ব অনুভূত হয়।

নামের মহিমা ব্যাখ্যায় হরিদাস আর এক কথা বলিলেন যে—তর্ক দ্বারা নামের মহিমা বুঝা যায় না। জপ করিলে তবে ইহার ফল বুঝা যায়।—

তর্কের গোচর নহে নামের মহত্ব।
—(চৈঃ চঃ—অন্ত্য, ৩য় পঃ)

১৫১৫ খৃঃ কাশীতে সনাতনকে শিক্ষা দিবার সময়ও মহাপ্রভু তর্ক করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।—(চৈতন্যচরিতামৃত উল্লেখযোগ্য)। বৈষ্ণব ধর্ম্মে তর্কের প্রতি সর্ব্বদাই একটা নিষেধ-আজ্ঞা পাওয়া যায়। কিন্তু এক্ষেত্রেও হরিদাস মহাপ্রভুর পূর্ব্বগামী।

এইবার হরিদাস আবার শান্তিপুর আসিলেন। 'শ্রীপাট শান্তিপুর আসি উদয় হইল।' "শ্রীঅদ্বৈত প্রভু দেখি প্রিয় হরিদাসে। আইস

বাপ বলি প্রেমানন্দরসে ভাসে হরিদাস শ্রীঅদ্বৈতকে 'অষ্ট অঙ্গে প্রণমিয়া কহে দৈন্য ভাষ'—

নিত্য ধর্ম্ম নষ্ট করে দুষ্ট ম্লেচ্ছগণে॥
দেবতা প্রতিমা ভাঙ্গি করে খণ্ড খণ্ড।
দেব পূজার দ্রব্য সব করে লণ্ড ভণ্ড॥
শ্রীমদ্ভাগবত আদি ধর্ম্মশাস্ত্রগণে।
বল করি পোড়াইয়া ফেলায় আগুণে॥
ব্রাহ্মণের শঙ্খ ঘণ্টা কাড়ি লঞা যায়।
অঙ্গের তিলক মুইছা বলে চাটি খায়॥
শ্রীতুলসী বৃক্ষে মুতে কুকুরের সনে।
দেবগৃহে মলত্যাগ করে দুষ্ট মনে॥
পূজায় বসিলে দেয় কুলকুচা জল।
সাধুকে তাড়না করে বলিয়া পাগল॥
হেনমতে কত শত দুষ্ট ব্যবহারে।
অবহেলে সর্ব্ব ধর্ম্ম কর্ম্ম নষ্ট করে॥
—(ঈঃ নাঃ)

ধর্ম্মের গ্লানি, অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব যখন হয়, 'সেই সেই কালে কৃষ্ণ হয় আবির্ভাব'। "কৃষ্ণের প্রকট বিনু নাহি প্রতিকার।" শ্রীঅদ্বৈত "এত কহি হুঙ্কার করয়ে ঘনে ঘনে। হরিদাস প্রেমাবেশে করয়ে নর্ত্তনে॥"—(ঈঃ নাঃ—পৃঃ ১০৬)।

হিন্দুর দিক হইতে শ্রীঅদ্বৈত ভাবিতেছিলেন—কী করিয়া হিন্দুর সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা দূর করা যায়। আর মুসলমানের দিক হইতে হরিদাস ভাবিতেছিলেন—কী করিয়া মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা দূর করা যায়। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন যে, শ্রীঅদ্বৈত—

জগত নিস্তার লাগি করেন চিন্তন।
অবৈষ্ণব জগত কেমনে হইবে মোচন॥
কৃষ্ণ অবতারিতে অদ্বৈত প্রতিজ্ঞা করিল।
জল তুলসী দিয়া পূজা করিতে লাগিল॥

আবার অন্তদিকে—

হরিদাস করে গোঁফায় নাম সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবেন এই তার মন ॥

তারপরে—

দুই জনের ভক্ত্যে চৈতন্য কৈল অবতার।
নাম প্রেম প্রচারি কৈল জগত উদ্ধার ॥
—(চৈঃ চঃ—অন্ত্য, ৩য় পঃ)

এখানে চরিতামৃত স্পষ্টই বলিলেন যে—দুইজনের ভক্তিতে চৈতন্য অবতার হইলেন।

অদ্বৈত ও হরিদাসের ভক্তিতে শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণ-অবতার হওয়া

সুতরাং মহাপ্রভু যবন হরিদাসকে বৈষ্ণব করেন নাই। যবন হরিদাসই অধ্যাপক নিমাই পণ্ডিতকে টোল ছাড়াইয়া নূতন ধর্ম্ম প্রচারে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। হরিদাস-চরিত্রের ইহাই ঐতিহাসিক গুরুত্ব।

মহাপ্রভু হরিদাসকে তাঁহার নূতন সম্প্রদায়ে যেরূপ সম্মানের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন, শ্রীঅদ্বৈত কিন্তু মহাপ্রভুর পূর্ব্বেই হরিদাসকে সেই উচ্চ সম্মান দিয়াছিলেন। এক্ষেত্রে অদ্বৈতের উদারতা পূর্ব্বগামী।

এইবার ব্রাহ্মণগণ হরিদাসের সংস্রবের জন্য শ্রীঅদ্বৈতকে সমাজে বর্জ্জন করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল।—

শ্রীঅদ্বৈতের উপর পাষণ্ডিগণের সামাজিক নির্যাতন

কুলীন ব্রাহ্মণগণ কহে পরস্পরে ॥
হরিদাসের সঙ্গ যদি না ছাড়ে আচার্য্য।
সমাজেতে সেই সত্য হইবেক বর্জ্জ্য ॥
আচার্য্য তাহাতে নাহি মনোযোগ কৈলা।
প্রভুরে পাষণ্ডিগণ বর্জ্জন করিলা ॥
প্রভু কহে ভাল ভাল অসৎ সঙ্গ গেল।
আমাতে শ্রীভগবান দয়া প্রকাশিল ॥

হরিদাসকে বলিলেন—"তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রহ্মভূজ্যের ফল।" শ্রীঅদ্বৈত-চরিত্রের দৃঢ়তা বুঝা গেল। দৃঢ়তা ব্যতিরেকে ইতিহাসে কোন চরিত্রই স্থায়িত্ব লাভ করে না।

রোজ রোজ একজন বড় ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আসিয়া একজন মুসলমান খাইতেছেন। হরিদাস ভাবিলেন—এতে যদি ব্রাহ্মণসমাজে কোন কথা হয়; সুতরাং যা রয়সয়, তাই করাই ভাল।—

হরিদাস কহে গোসাঞি করি নিবেদন।
মোরে প্রত্যহ অন্ন দেহ কোন প্রয়োজন॥
মহা মহা বিপ্র হেথা কুলীন সমাজ।
আমারে আদর কর না বাসহ লাজ॥
অলৌকিক আচার তোমা কহিতে পাই ভয়।
সেই কৃপা করিবে যাতে তোমা রক্ষা হয়॥

—(চৈঃ চঃ—অন্ত্য, ৩য় পঃ)

প্রত্যুত্তরে—

আচার্য্য কহেন তুমি না করিহ ভয়।
সেই আচরিব যেই শাস্ত্রমত হয়॥
তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন।
এত বলি শ্রাদ্ধপাত্র করাইল ভোজন॥

—(চৈঃ চঃ—অন্ত্য, ৩য় পঃ)

ব্রাহ্মণের শ্রাদ্ধপাত্র হরিদাসকে মহাপ্রভু খাওয়াইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা অদ্বৈতের খাওয়াইবার অনেক পরে।

অদ্বৈতের নবদ্বীপে টোল

নিমাই যখন শচীগর্ভে (১৪৮৫ খৃঃ), আচার্য্য অদ্বৈত তখন নবদ্বীপে আসিয়া টোল করিয়া ছাত্র পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। "নবদ্বীপ টোল কৈলা গৌরাঙ্গ লাগিয়া।" হরিদাসও সঙ্গে আসিলেন। "হরিনাম স্মরি হরিদাস পিছে ধায়।"—

দিনে প্রভু ছাত্র পড়ায় গীতা ভাগবত।
কভু বেদ স্মৃতি পড়ায় ছাত্রের ইচ্ছামত॥

রাত্রে হরিদাস সঙ্গে করিয়া মিলন।
উচ্চৈঃস্বরে করে হরিনাম সংকীর্ত্তন ॥
—(ঈঃ নাঃ—পৃঃ ১০৯)

জয়ানন্দ বলিয়াছেন—নবদ্বীপ থাকাকালে হরিদাস এক বৃক্ষের কোটরে বাস করিতেন। ১৪৮৬ খৃঃ ফাল্গুনী পূর্ণিমা দিনে নিমাইয়ের জন্ম হইল। ঈশান নাগর লিখিয়াছেন যে—নিমাই ছাত্রাবস্থায় গদাধরকে সঙ্গে লইয়া "পড়িবার তরে, আইলা আচার্য্যের স্থানে।" ইতিপূর্ব্বে নিমাই—গঙ্গাদাস পণ্ডিত, বিষ্ণু মিশ্র, সুদর্শন পণ্ডিত, পরে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকট ব্যাকরণ সাহিত্য অলঙ্কার স্মৃতি জ্যোতিষ ষড়দর্শন ও তর্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। গণনায় দেখা যায়, ১৫০১ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ১৫ বৎসর বয়সে নিমাই বেদপঞ্চানন শ্রীঅদ্বৈতের কাছে আসিলেন বেদ পড়িবার জন্য—"এবে তুঁয়া পাশে আইলাম বেদ পড়িবারে।" এই ঘটনার পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে (১৪৯৬ খৃঃ) নিমাইয়ের পিতা জগন্নাথ মিশ্র দেহ রক্ষা করেন। সেই সময় হরিদাস ঠাকুর নবদ্বীপেই ছিলেন।—

জগন্নাথ মিশ্রের মৃত্যুর সময় হরিদাস নবদ্বীপে

গুরুগৃহে গৌরাঙ্গ পুস্তক লেখেন যথা।
রড়দিয়া হরিদাস ঠাকুর গেল তথা ॥
হরিদাস ঠাকুর বলেন কি পুঁথি লেখ।
তোমার বাপ অন্তর্জ্জলে ঝাট গিয়া দেখ ॥
—(জয়ানন্দ, চৈঃ মঃ—নদীয়া খণ্ড)

নিমাইয়ের প্রথমা স্ত্রী লক্ষ্মীর যখন অন্তর্জ্জলী হয়, তখন সেই মৃত্যুপথযাত্রী লক্ষ্মী বলিয়াছিলেন যে—হরিদাস ঠাকুরকে একদিন রন্ধন করিয়া খাওয়াইয়াছিলাম। সুতরাং তখনও আমরা হরিদাসকে নবদ্বীপে দেখিতে পাই। ইহা সম্ভবতঃ ১৫০৪ খৃষ্টাব্দের ঘটনা।

হরিদাস এই সময় শুধু নবদ্বীপে ছিলেন না, ফুলিয়া ও শান্তিপুরে গমনাগমন করিতেন। হরিদাস যখন ফুলিয়ায় অবস্থান করিতেছিলেন, তখন হরিদাসের ভজনের কথা গৌড়েশ্বরের কানে গেল।

না যাইবার কথা কি। ইহা একটা মস্ত ঘটনা। মুসলমান হিন্দু হইয়া যাইতেছে, সর্ব্বনাশ!—

কাজী গিয়া মুলুকের অধিপতিস্থানে।
কহিলেন তাহার সকল বিবরণে॥
যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার।
ভালমতে তারে আনি করহ বিচার॥
—(চৈঃ ভাঃ—আদি, ১১শ অঃ)

মুলুকের অধিপতি অর্থে, কাজীর ঊর্দ্ধতন বিচারপতি। হরিদাসকে গঙ্গার ঘাটে (ফুলিয়ায়) তাঁহার গোঁফা হইতে ধরিয়া নিয়া মুলুকপতির দরবারে উপস্থিত করা হইল। মুলুকপতি সসম্ভ্রমে বসিবার আসন দিলেন, এবং নিজেই হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহা ঠিক কোন্ বৎসরের কথা, কোন চরিতকারই স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করেন নাই। ১৫০৬-৭-৮ খৃঃ হইতে পারে। হরিদাসকে বলিলেন—

বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করায় হরিদাসের বিচার

কেনে ভাই, তোমার কিরূপ দেখি মতি॥
কত ভাগ্যে দেখ তুমি হইয়াছ যবন।
তবে কেন হিন্দুর আচারে দেহ মন॥
আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত।
তাহা তুমি ছোড় হই মহাবংশ জাত॥
জাতি ধর্ম্ম লঙ্ঘি কর অন্য ব্যবহার।
পরলোকে কেমনে বা পাইবে নিস্তার॥
না জানিয়া যে কিছু করিলা অনাচার।
সে পাপ ঘুচাহ করি কলিমা উচ্চার॥
—(চৈঃ ভাঃ—আদি, ১১শ অঃ)

মুলুকপতির এই কথার মধ্যে, হিন্দুর প্রতি মুসলমানের মনোভাবের একটা চিত্র আমরা পাই। মুসলমানের নিকট হিন্দু অস্পৃশ্য—"আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত।" হরিদাস রাজার জাতি।

হরিদাস মহাহাস্ত করিলেন। এবং উত্তরে যাহা বলিলেন, তাহা মনুষ্যজাতির শ্রদ্ধার সহিত মনে করিয়া রাখিবার কথা—যতদিন বিভিন্ন ধর্ম্ম পৃথিবীতে থাকিবে। হরিদাস বলিলেন—

শুন বাপ, সভারই একই ঈশ্বর॥
নাম মাত্র ভেদ করে হিন্দুয়ে যবনে।
পরমার্থে এক কহে কোরানে পুরাণে॥
এক শুদ্ধ নিত্য বস্তু অখণ্ড অব্যয়।
পরিপূর্ণ হই বৈসে সভার হৃদয়॥
সেই প্রভু যারে যেন লওয়া য়েন মন।
সেই মত কর্ম্ম করে সকল ভুবন॥
সে প্রভুর নাম গুণ সকল জগতে।
পালেন সকল মাত্র নিজ শাস্ত্র মতে॥
*　　*　　*
এতেক আমারে সে ঈশ্বর যে হেন।
লওয়াইছেন চিত্তে, করি আমি তেন॥
হিন্দুকুলে কেহ যেন হইয়া ব্রাহ্মণ।
আপনেই গিয়া হয় ইচ্ছায় যবন॥
হিন্দু বা কি করে তারে, যার যেই কর্ম্ম।
আপনে যে মৈল তারে মারিয়া কি ধর্ম্ম॥
মহাশয়, তুমি এবে করহ বিচার।
যদি দোষ থাকে শাস্তি করহ আমার॥

—(চৈঃ ভাঃ—আদি, ১১শ অঃ)

এক ধর্ম্ম হইতে অন্য ধর্ম্ম গ্রহণকালে এরকম বিশ্বজনীন উদার অসাম্প্রদায়িক কথা ইতিহাসে আর শুনি নাই—

(ক) ঈশ্বর এক, কেবল নামে ভিন্ন। (খ) প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীন ইচ্ছামতে যে-নামে ইচ্ছা ঈশ্বরকে ভজনা করিবেন।

হরিদাসের উক্তিতে এই মহান্ সত্য—রাজশক্তির নিকট প্রজার

ব্যক্তিগত স্বাধীন মতের এই দাবী—বাঙলার পাঠান একদিন উত্থাপন ও সমর্থন করিয়া গিয়াছে।

হরিদাসের কথায় কোন ফল হইল না, 'শাস্তি করহ ইহারে'।

এই দুষ্টু আরো দুষ্টু করিবে অনেক।
যবনকুলের অমহিমা আনিবেক॥

আর যদি কলিমা উচ্চারণ করে, তবে ছাড়িয়া দেওয়া যায়। মুলুকপতি বলিলেন—

আরে ভাই,
আপনার শাস্ত্র বোল তবে চিন্তা নাই,
অন্যথা করিব শাস্তি সব কাজিগণে,
বলিবাও পাছে, আর লঘু হৈবা কেনে।

হরিদাস সে-শ্রেণীর জীব নহেন—যাহারা ভয়ে পাছে বলে। শাস্তির ভয় দেখান মাত্রই সিংহ গর্জ্জন করিয়া উঠিল।—

খণ্ড খণ্ড হই দেহ যদি যায় প্রাণ।
তভো আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥
—(চৈঃ ভাঃ—আদি, ১১শ অঃ)

বাঙলার পাঠান-বৈষ্ণবের এই দৃষ্টান্ত হইতে সেদিনের হিন্দু-বৈষ্ণবের কি কিছু শিক্ষণীয় ছিল না?

শাস্তি হইল। বাইশবাজারে নিয়া হরিদাসকে চাবুক মারা হইল।—

বাইশবাজারে হরিদাসের বেত্রদণ্ড

বাজারে বাজারে সব বেরি দুষ্ট গণে
মারয়ে নির্জ্জীব করি মহাক্রোধ মনে।
—(চৈঃ ভাঃ—আদি, ১১শ অঃ)

ষোড়শ শতাব্দীর নূতন ধর্ম্মকে বাইশবাজারের চাবুকের আঘাত সহ্য করিয়া, জয় করিয়া, তবে ইতিহাসপথে বাহির হইতে হইয়াছে। আজ যাহা পিরিত্তিরসের ভিয়ান দিয়া এত সহজ মনে হয়—সেদিন তাহা এত সহজ ছিল না।

হরিদাসকে মৃত ভাবিয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দিল। কিন্তু তিনি মরেন নাই। কাজেই আবার জ্ঞান পাইয়া উঠিয়া আসিলেন। এবার মুলুকপতি হরিদাসকে ডাকাইয়া নিয়া দরবারে পীরজ্ঞানে নমস্কার করিলেন। আর বলিলেন—

গঙ্গাতীরে থাক গিয়া নির্জ্জন গোঁফায়॥
আপন ইচ্ছায় তুমি থাক যথা তথা।
যে তোমার ইচ্ছা, তাহি করহ সর্ব্বথা॥
—(চৈঃ ভাঃ—আদি, ১১শ অঃ)

এই প্রসঙ্গে একটি বিশেষ কথা বলিবার আছে। গ্রন্থে সর্ব্বত্র উল্লেখ আছে যে—যখন প্রহরীরা বাইশবাজারে হরিদাসকে চাবুক মারিতেছিল, তখন তিনি প্রহরীদের মঙ্গল কামনা করিতেছিলেন। মহাপ্রভু ইহা পারিতেন না। পারিলে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ পারিতেন, আর কেহকে মনে হয় না। আর যাঁহাকে মনে হয়, তিনি ঈশ্বরের মহিমান্বিত পুত্র যীশু খৃষ্ট।

মহাপ্রভু হরিদাসের সহিত সাক্ষাতের সময় বলিয়াছিলেন যে, হরিদাসের রক্তাক্ত পৃষ্ঠে চাবুকের আঘাত দেখিয়া তিনি বৈকুণ্ঠ হইতে চক্র নিয়া আসিতেছিলেন।—

দেখিয়া তোমার দুঃখ চক্র ধরি করে।
নামিনু বৈকুণ্ঠ হইতে সভা কাটিবারে॥
—(চৈঃ ভাঃ—মধ্য, ১০ম অঃ)

কিন্তু তখন তিনি বৈকুণ্ঠে ছিলেন না। নবদ্বীপে টোলে ছাত্রদের ব্যাকরণ পড়াইতেছিলেন।

প্রাণান্ত করিয়া তোমা মারে সে সকল।
তুমি মনে চিন্ত্য তাহা সভার কুশল॥
আপনে মারন খাও তাহা নাহি দেখ।
তখনেহ তা সভারে মনে ভাল দেখ॥
—(চৈঃ ভাঃ—মধ্য, ১০ম অঃ)

কাজেই হরিদাসের সঙ্কল্পের বিরুদ্ধে চক্র কিছু করিতে পারিল না। অলৌকিক চক্র নয়—অলৌকিক 'তথনেহ তা সভারে মনে ভাল দেখ'। এত বড় ক্ষমা মুসলমান পাইল কোথা হইতে? বৈষ্ণবধর্ম্মে ইহাই বাঙ্‌লার পাঠানের দান। যে বৈষ্ণব, সে এই দান কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিবে। মহাপ্রভু নিজে এই দান তাঁহার ধর্ম্মে হরিদাসের নিকট হইতে দুই হাত পাতিয়া গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন—যেমন শ্রীপাদ নিত্যানন্দের নিকট হইতে জগাইমাধাই-উদ্ধার-স্বরূপ দান গ্রহণ করিয়াছেন।

হরিদাস নবদ্বীপে আসিলেন। অদ্বৈত ও আসিলেন। নিত্যানন্দ আসিয়াছেন। সংকীর্ত্তন শ্রীবাসের বাড়ীতে চলিতেছে। মহাপ্রভু টোল ছাড়িয়া প্রচারের কথা ভাবিতেছেন। প্রথম সাক্ষাতেই প্রভু হরিদাসকে বলিলেন—

এই মোর দেহ হইতে তুমি মোর বড়।
তোমার যে জাতি সেই জাতি মোর দর॥

—(চৈঃ ভাঃ—মধ্য, ১০ম অঃ)

চৈতন্যভাগবতে আছে যে—

যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতি বুদ্ধি করে।
কোটি কোটি জন্ম অধম যোনিতে ডুবি সে মরে॥

—(চৈঃ ভাঃ—মধ্য, ১০ম অঃ)

মহাপ্রভু আর হরিদাস—এক জাতি হইলেন। প্রভু আরও বলিলেন—

যেবা গৌণ ছিল মোর প্রকাশ করিতে।
শীঘ্র আইনু, তোর দুঃখ না পারি সহিতে॥

—(চৈঃ ভাঃ—মধ্য, ১০ম অঃ)

ইহাতেই প্রমাণ হয়, মহাপ্রভুর ধর্ম্মপ্রচারে হরিদাস-চরিত্রের কত বেশী প্রয়োজন হইয়াছিল। মহাপ্রভুর প্রকাশ হওয়ার একটি কারণ—হরিদাসের উপর যবনরাজ-অত্যাচার।

জয়ানন্দ বলেন যে, নিমাইয়ের সহিত হরিদাসের প্রথম মিলনের পর নিমাই তাঁকে বলিলেন—

হবিষ্যান্ন দিবে মা হরিদাস মহাশয়।
মোহান্তের সেবা সে অনেক ভাগ্যে হয়॥
শ্রীমূর্ত্তির সেবা হইতে মোহান্তের সেবা বড়।
মোহান্ত শরীরে কৃষ্ণ আপনে সুদৃঢ়॥
মোহান্ত দর্শন হেতু শ্রীমূর্ত্তির সেবা।

"শ্রীমূর্ত্তির সেবা হইতে মোহান্তের সেবা বড়"

মূর্ত্তিপূজা অপেক্ষা নরপূজা বড়—অতি বড় বিদ্রোহের কথা।

চৈতন্য-চরিতামৃতেও ইহার অনুরূপ কথা আছে।—

কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ।

একটা চুক্তিতে হরিদাস, প্রভুর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন।—

তোমার চরণ ভজে যেসকল দাস।
তার অবশেষ যেন হয় মোর গ্রাস॥
সফল করহ দাসে উচ্ছিষ্ট দিয়া তোর।

তারপরেই প্রচার।—

একদিন আচম্বিতে হৈল হেন মতি।
আজ্ঞা দিল নিত্যানন্দ হরিদাস প্রতি।
শুন শুন নিত্যানন্দ শুন হরিদাস।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
ইহা বই আর না বলিবা বোলাইবা।
দিবা অবসানে আসি আমারে কহিবা॥
—(চৈঃ ভাঃ—মধ্য, ১৩শ অঃ)

মহাপ্রভুর আজ্ঞায় বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রথম প্রচারক শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ও যবন হরিদাস

ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণবধর্ম্মের দুই প্রথম প্রচারক নিত্যানন্দ

ও হরিদাস—হিন্দু ও মুসলমান। সেদিন নবদ্বীপে ব্রাহ্মণপ্রধান হিন্দু-সমাজের ভিত্তিতে এক ভূমিকম্প অনুভূত হইবার কথা।

জগাইমাধাই উদ্ধার

জগাইমাধাই উদ্ধারে হরিদাস নিত্যানন্দের সঙ্গী। নিত্যানন্দ একা নহেন।

চাঁদ কাজীর বাড়ী আক্রমণ ও লুণ্ঠনের অভিযানে হরিদাসের স্থান আচার্য্য অদ্বৈতের পরেই। সংকীর্ত্তনের প্রথম দলের পুরোভাগে

চাঁদ কাজীর বাড়ী আক্রমণ ও লুণ্ঠন

শ্রীঅদ্বৈত, এবং তাঁহার পরের দলের পুরোভাগে শ্রীহরিদাস ঠাকুর। তাঁহার পরের দলের পুরোভাগে শ্রীবাস এবং সর্ব্বশেষ দলের মধ্যভাগে মহাপ্রভু স্বয়ং—দক্ষিণে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ, বাম দিকে গদাধর পণ্ডিত।

কাটোয়াতে সন্ন্যাস লওয়ার পরে (১৫১০ খৃঃ ফেব্রুয়ারীর শেষে) প্রভু প্রথমে অতিথি হইলেন ফুলিয়ায় হরিদাসের কুটিরে। ইহাও কি কম বিপ্লবের কথা? পরে, শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতের বাড়ী প্রভু যান।

১৫১৪ খৃষ্টাব্দে মহাপ্রভু যখন রূপসনাতনকে হুসেন শাহর মন্ত্রীত্ব ছাড়াইয়া দলে আনিবার জন্য অনুরোধ করিতে রামকেলী আসেন (গৌড়ের নিকট), তখন শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ও হরিদাস ঠাকুর প্রভুর

মহাপ্রভুর কানাইয়ের নাটশালায় আগমন

সঙ্গে ছিলেন। শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের (সাকর মল্লিক ও দবীর খাস) প্রথম সাক্ষাৎ শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ও হরিদাসের সঙ্গেই। শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনকে দলে আনিবার মন্ত্রণায় হরিদাসের পরামর্শ কতখানি ছিল, চিন্তার বিষয়। কেননা, রূপসনাতন জন্মে যাহাই হউন, কর্ম্মে ম্লেচ্ছ হইয়া গো-ব্রাহ্মণদ্রোহী সঙ্গে—নিজেদের স্বীকার উক্তিতেই—মিশিয়া গিয়াছিলেন। হিন্দুসমাজ এজন্য তাঁহাদিগকে ক্ষমা করে নাই। বর্জ্জন করিয়াছিল। রামকেলীতে রূপদীঘি, সনাতনদীঘির জল সং ব্রাহ্মণেরা সেদিন পর্য্যন্ত খাইত না। এখন খায় কিনা জানি না।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাঙালী যে নূতন ধর্ম্মের আন্দোলন করিয়াছিল, তাহাতে হিন্দু ও মুসলমানের সমান অধিকার। হিন্দু ও মুসলমান সমান অধিকারে এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে—একথা যেমন সত্য, তেমনি একথাও সত্য যে, একদিন হিন্দুর সঙ্গে একত্রে মুসলমানও এই ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছিল, প্রচার করিয়াছিল, গ্রহণ করিয়াছিল। ইতিহাস ইহার সাক্ষী। বৈষ্ণবগ্রন্থে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ বিদ্যমান। যবন হরিদাস, যিনি বৈষ্ণবগ্রন্থে পরে ঠাকুর হরিদাস ও ব্রহ্মার অবতার বলিয়াই খ্যাত—তাঁহার অনুপম ধর্ম্মজীবন ইহার সাক্ষী।

বহু প্রতিভার একত্র সমাবেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের অভ্যুদয়

মহাপ্রভুর বৈষ্ণবধর্ম্ম, একা মহাপ্রভুর সৃষ্টি নয়। অনেক বড় বড় প্রতিভা মহাপ্রভুর অবিসংবাদিত নেতৃত্বের অধীনে আসিয়া পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া প্রাণময় গতিশীল, এমন কি উদ্দাম অভিনব এক অখণ্ড বস্তুরূপে গৌড় বঙ্গে, উৎকলে, মথুরা ও বৃন্দাবনের আকাশে নব গরিমায় উদিত হইয়াছিল—সূর্য্যের মত জ্যোতিষ্মান, চন্দ্রের মত শীতল। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম প্রভাত বাঙ্গালীর ইতিহাসে, জাতির ইতিহাসে এক স্বতন্ত্র, স্বাধীন নবযুগ আগমনের ধ্বনি-মুখরিত নূতন প্রভাত। বৈষ্ণবধর্ম্মের অভ্যুত্থান বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসে এক নবযুগের আগমন। আর মহাপ্রভু স্বয়ং এই যুগের যুগাবতার।

বৈষ্ণবধর্ম্ম একটা বিদ্রোহের ধর্ম্ম

হিন্দু ও মুসলমান—এই উভয় ধর্ম্মের, বিশেষতঃ হিন্দুর ব্রাহ্মণ-প্রধান, ব্রাহ্মণ-শূদ্র ভেদমূলক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত বাঙালীর বৈষ্ণবধর্ম্মে একটা বিদ্রোহ আছে। বৈষ্ণবধর্ম্মই একটা বিদ্রোহের ধর্ম্ম। বৈষ্ণবধর্ম্মটাই একটা বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহ বাঙালী ষোড়শ শতাব্দীতে করিয়াছিল। বাঙলার অনেক বিখ্যাত হিন্দু ও মুসলমান তাহাদের নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম ও সমাজের সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করিয়া একত্রে এই বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিল।

মহাপ্রভু এই বিদ্রোহের চরম বিকাশ। মহাপ্রভুর আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রীবাসের বাড়ীতে অভিষেক করিয়া বৈষ্ণব আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার উদ্যোগ-পর্ব্বে আমরা যাঁহাদের দেখিতে পাই, তাঁহাদের মধ্যে প্রধান যে দুই জন—তাঁহাদের মধ্যে একজন আচার্য্য অদ্বৈত, আর একজন ঠাকুর হরিদাস। শুধু একা অদ্বৈতের হুঙ্কারেই নিমাই পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণের অবতার হইয়া অবতীর্ণ হন নাই। অদ্বৈতের সঙ্গে সেদিন যবন হরিদাসও ছিলেন। অদ্বৈত ও যবন হরিদাস, এই 'দুই জনের ভক্ত্যে চৈতন্য কৈল অবতার।'—(চৈঃ চঃ—অঃ লীঃ)।

বাঙালীর এই নূতন ধর্ম্মের আর একটা বিশেষত্ব যে—ইহা ইচ্ছা করিয়াই নীচ জাতি দ্বারা প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। এই প্রচার ব্রাহ্মণপ্রধান, ব্রাহ্মণ-শূদ্র ভেদমূলক হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে এক স্পষ্ট বিদ্রোহ। প্রথম প্রচারকমণ্ডলী নির্ব্বাচন ব্যাপারে মহাপ্রভুর মনে এই বিদ্রোহের আভাস আমরা পাই। চৈতন্য-চরিতামৃতকার একথা উল্লেখ করিয়াছেন, স্বীকার করিয়াছেন। "সন্ন্যাসী পণ্ডিতগণের করিতে গর্ব্ব নাশ; নীচ শূদ্র দ্বারা করে ধর্ম্মের প্রকাশ।" দৃষ্টান্ত দিতেছেন—

"নীচ শূদ্র দ্বারা করে ধর্ম্মের প্রকাশ" এবং "হরিদাস দ্বারা নাম মাহাত্ম্য প্রকাশ"

ভক্তিতত্ত্ব প্রেম কহে রায় করি বক্তা।
আপনি প্রদ্যুম্ন মিশ্র সহ হয় শ্রোতা॥
হরিদাস দ্বারা নাম মাহাত্ম্য প্রকাশ।
সনাতন দ্বারা ভক্তি সিদ্ধান্ত বিলাস॥
শ্রীরূপের দ্বারা ব্রজের রস প্রেম লীলা।
কে কহিতে পারে গম্ভীর চৈতন্যের খেলা॥

—(চৈঃ চঃ—অঃ লীঃ)

কবিরাজ গোস্বামী—আচার্য্য অদ্বৈত বা শ্রীপাদ নিত্যানন্দের নাম উল্লেখ করিলেন না। তার কারণ, তাঁহারা দুইজনে তো নীচ শূদ্র নহেন।

"হরিদাস দ্বারা নাম মাহাত্ম্য প্রকাশ।"—মহাপ্রভু বিশেষ

বিবেচনা করিয়াই ইহা করিয়াছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতকার এই ব্যাপারকে প্রভুর খেলা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ইহা তাঁহার ছেলেখেলা নয়। এই খেলার মধ্যে এমন এক বার্ত্তা ছিল এবং আছে—যাহা বাঙ্গালী হয় ভুলিয়া গিয়াছে, না-হয় আজিও বুঝিতে চেষ্টা করে নাই। অথবা বুঝিয়াও গোপন করিয়া চলিয়াছে।

নীচ জাতি, ম্লেচ্ছ জাতি বলিয়া অনেক প্রচারক প্রচারকার্য্যে স্পষ্ট কুণ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু মহাপ্রভু তাঁহাদের কুণ্ঠার প্রশ্রয় দেন নাই। দ্বিগুণ উৎসাহে এই বিদ্রোহ-অভিযানে তাঁহাদের উদ্বোধিত করিয়াছেন। রায় রামানন্দ নিজেকে শূদ্র বলিয়া আপত্তি করিয়াছেন। প্রভু সে আপত্তি শোনেন নাই।—

কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেন নয়।
যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ব-বেত্তা সেই গুরু হয়॥

সনাতন বৈষ্ণব স্মৃতি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। মহাপ্রভুর আদেশেও ভরসা পান নাই, আপত্তি করিতেছিলেন। প্রভু বলিলেন—তুমি লেখ, তোমাকেই লিখিতে হইবে।—

যে যে করিতে তুমি করিবে মনন।
কৃষ্ণ তাহা তাহা তোমা করাবে স্ফুরণ॥

এইরূপে হরিদাসকে দিয়া শুধু নামের মাহাত্ম্য প্রচার নয়, উৎকলে এক শ্রাদ্ধবাড়ীতে ব্রাহ্মণের শ্রাদ্ধপাত্র হরিদাসকে খাওয়াইয়াছিলেন। শ্রীঅদ্বৈতের কথাই মনে হয়—"তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন।"

ইহা আকস্মিক নহে। ইহা ষোড়শ শতাব্দীর নূতন আন্দোলনের অভিনবত্ব—বিশেষত্ব। হরিদাসের কুণ্ঠা সত্ত্বেও প্রভু একরূপ জোর করিয়া এবং জেদ করিয়াই এই কার্য্য করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালেও এই বিষয়ে হরিদাসের মনে কুণ্ঠা না-থাক, একটা ভক্তি-মিশ্র বিহ্বলতা ও কৃতজ্ঞতা ছিল। মৃত্যুকালে প্রভুকে বলিয়াছিলেন—

অনেক নাচালে মোরে প্রসাদ করিয়া।
বিপ্রের শ্রাদ্ধপাত্র খাইনু ম্লেচ্ছ হইয়া॥

মথুরা বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পথে (১৫১৬ খৃঃ) মহাপ্রভু নিজে পাঠান মুসলমানকে বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করাইয়াছিলেন। "সেই ত পাঠান সব বৈরাগী হইলা। পাঠান বৈষ্ণব বলি হইল তার খ্যাতি।"—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ১৯শ পঃ)। "প্রভু পশ্চিম আসিয়া কৈল যবনাদি ধন্য।"—ইহার কত পূর্ব্বে, মহাপ্রভুর জন্মিবার পূর্ব্বে (সম্ভবতঃ ১৪৭০ খৃঃ) আচার্য্য অদ্বৈত শান্তিপুরে ১৮ কিংবা ২০ বৎসরের যুবক যবন হরিদাসকে 'মাথা মুণ্ডাইয়া', তুলসীর মালা গলায় দিয়া, 'কটিতে কৌপীনডোর বান্ধিয়া', কর্ণে হরিনাম দিয়া, বৈষ্ণব করিয়াছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণবধর্ম্ম বহু প্রতিভার সংমিশ্রন, সমন্বয়। ইহার সাক্ষী ইতিহাস। এই সকল প্রতিভা একএকজনের এক-একরকম। রায়ের প্রতিভা হরিদাসের নয়, হরিদাসের সাধনপ্রণালী নিত্যানন্দের নয়। নিত্যানন্দের প্রচার-পদ্ধতি রূপ বা সনাতনের নয়। রূপ বা সনাতনের কার্য্য অদ্বৈত বা শ্রীবাস, এমন কি রঘুনাথেরও নয়। রূপ সনাতনের ত্যাগের সহিত রঘুনাথের ঐশ্বর্য্য-ত্যাগের সাদৃশ্য আছে, দীনতায় সাদৃশ্য আছে। কিন্তু প্রতিভার স্বাতন্ত্র্যও খুব স্পষ্ট। এমন কি, শ্রীরূপ ও সনাতনের মধ্যেও প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। হরিদাস করিতেন তিন লক্ষ নাম জপ, থাকিতেন নির্জ্জন নদী বা সমুদ্রতীরে গোঁফার ভিতরে সঙ্গিহীন একাকী। রায় থাকিতেন উদ্যান বাটিকায়; সঙ্গিনী থাকিত দুইজন সুন্দরী যুবতী, অভিনেত্রী নর্ত্তকী। রায় তাহাদিগকে স্বরচিত নাটকের অভিনয় শিখাইতেন। স্বহস্তে তাহাদের অঙ্গ প্রসাধন করিয়া দিতেন। মহাপ্রভুকে তাহাদের গীত শুনাইতেন, নৃত্য [illegible]। উড়িষ্যা-লীলায় এই নীচ শূদ্র রায় রামানন্দই

বহুমুখী বিভিন্ন বহু-প্রতিভার সমন্বয়-ভূমি মহাপ্রভুর ব্যক্তিত্ব

মহাপ্রভুর বৈষ্ণব ধর্ম্মের ও তত্ত্বের উপদেষ্টা গুরু। এবং মহাপ্রভু নিজে তার প্রধান শ্রোতা। হরিদাসে ও রায় রামানন্দে পার্থক্য আছে। একের কার্য্য অন্যের নয়, বরং প্রথম দৃষ্টিতে একে অন্যের বিরোধী। অথচ তাঁহারা বিরোধ করেন নাই। কারণ কি? এক অখণ্ড বৈষ্ণবধর্ম্মের ইহারা অচ্ছেদ্য দুই অঙ্গ। ইহাদের সমন্বয় হইয়াছে মহাপ্রভুর নেতৃত্বে। মহাপ্রভুর জীবনে এইখানে মহাপ্রভুর বৈশিষ্ট্য। বহুমুখী বিভিন্ন বহু-প্রতিভার সমন্বয়-ভূমি বলিয়া মহাপ্রভু এই সকল খণ্ড প্রতিভার মধ্যে এক অপূর্ব্ব অখণ্ড সর্ব্বাপেক্ষা দীপ্তিমান বড় প্রতিভা। ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণবধর্ম্ম বহুপ্রতিভার সমন্বয় বলিয়া তাহা বহু নয়, বিচ্ছিন্ন নয়, বিক্ষিপ্ত নয়। তাহা এক অখণ্ড প্রাণময় বস্তু। মহাপ্রভু এই প্রাণ। 'সূত্রে মণি গণা ইব'— এই বহু-মণিমাণিক্যে এক মালা গাঁথিয়া একসূত্রে বান্ধিয়া তিনি গলায় পরিয়াছিলেন, মাথায় তুলিয়াছিলেন। ইহাই বৈষ্ণবধর্ম্মের বৈচিত্র্যময় অখণ্ড রূপ। মহাপ্রভু নিজে সেই রূপ। অথচ কী অপরূপ!

এইবার হরিদাস প্রভুর সঙ্গে নীলাচলবাসী। সমুদ্রতীরে নির্জ্জন গোঁফায় প্রতিদিন তিনলক্ষ নাম জপে মগ্ন। তিনি কোনদিন জগন্নাথ দেখিতে যাইতেন না। নীলাচলে প্রভু একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন যে, উচ্চ নামকীর্ত্তনে কী ফল? উত্তরে হরিদাস সর্ব্বমুক্তির কথা পাড়িলেন। একা জপ করিলে নিজের মুক্তি হয় সত্য, কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে নাম জপ করিলে অন্য মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা, সমুদ্র, পর্ব্বত—এ সবের মুক্তি হইবে। বাঙলার বৈষ্ণব শুধু নিজের মুক্তি চায় নাই। সমস্ত জীবের, সমস্ত সংসারের মুক্তি চাহিয়াছিল। ইহাও হরিদাসের দান। জীবোদ্ধার শ্রীচৈতন্য অবতারের নবদ্বীপ-লীলার গোড়াকার আদর্শ। আচার্য্য অদ্বৈত ইহার প্রবর্ত্তক। আর ঠাকুর হরিদাস এই আদর্শের প্রতীক।

আর একদিন মহাপ্রভু হরিদাসকে (ক) যবন উদ্ধার, (খ) নাম মাহাত্ম্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন।—

হরিদাস, কলিকালে যবন অপার,
গো ব্রাহ্মণে হিংসা করে মহা দুরাচার,
ইহা সভার কোন মতে হইবে নিস্তার।

—(চৈঃ চঃ—অন্ত্য, ৩য় পঃ)

রাধিকার ভূমিকায় মাথুর বিরহে দিব্যোন্মাদে যখন প্রভু নীলাচলে লীলা করিতেছেন, তখনও তিনি যবন উদ্ধার ভুলিয়া যান নাই। চিন্তা করিতেছেন, পরামর্শ করিতেছেন। হরিদাস বলিলেন—

হরিদাস কহে প্রভু চিন্তা না করিহ।
যবন সকলের মুক্তি হবে অনায়াসে,
হা রাম হা রাম বলি কহে নামাভাসে।
মহাপ্রেমে ভক্ত কহে হা রাম হা রাম,
যবনের ভাগ্য দেখ লয় সেই নাম।

—(চৈঃ চঃ—অন্ত্য, ৩য় পঃ)

নাম মাহাত্ম্য কিরূপ ?

যত্তপি সঙ্কেতে তার হয় নামাভাষ।
তথাপি নামের তেজ না হয় বিনাশ॥
নামের অক্ষর সব এই ত স্বভাব।
ব্যবহিত হৈলে না ছাড়ে আপন প্রভাব॥

(চৈঃ চঃ—অন্ত্য, ৩য় পঃ)

ইহাই হরিদাসের সিদ্ধান্ত।

এইবার হরিদাসের নির্ব্বাণের কথা। এবং শেষ কথা। সে এক অদ্ভুত ঘটনা। হরিদাসের নাম জপ শেষ হয় না। ভোজ্য অভক্ষিত থাকিয়া যায়। শরীর অসুস্থ মনে করিয়া প্রভু নিজে আসিলেন। বলিলেন—হরিদাস সুস্থ হও। হরিদাস উত্তর করিলেন—"শরীর সুস্থ হয় মোর, অসুস্থ বুদ্ধি আর মন।"

হরিদাসের নির্বাণ

প্রভু কহে কোন ব্যাধি কহ তো নির্ণয়।
তিঁহো কহে সংখ্যা কীর্ত্তন না পূরয় ॥
প্রভু কহে বৃদ্ধ হইলা এবে সংখ্যা অল্প কর।
সিদ্ধ দেহ তুমি সাধনে আগ্রহ কেন ধর ॥
লোক নিস্তারিতে এই তোমা অবতার।
নামের মহিমা লোকে করিলা প্রচার ॥
এবে অল্প সংখ্যা করি কর সংকীর্ত্তন।

—(চৈঃ চঃ—অন্ত্য, ১১শ পঃ)

হরিদাস অস্বীকার করিলেন। বলিলেন—

লীলা সম্বরিবে তুমি লয় মোর চিত্তে,
সেই লীলা প্রভু মোরে কভু না দেখাইবা,
তোমার আগে আমি মৃত্যু ইচ্ছা করি।

—(চৈঃ চঃ—অন্ত্য, ১১শ পঃ)

প্রভু বলিলেন: "কিন্তু আমার যে-কিছু সুখ, সব তোমা লইয়া। তোমা যোগ্য নহে যাবে আমারে ছাড়িয়া। হরিদাস চরণে ধরি কহে, না করিহ মায়া।" তোমার লীলার সহায় এখন কত কোটি ভক্ত আছে?—

আমা হেন যদি এক কীট মরি গেল।
এক পিপীলিকা মৈলে পৃথিবীর কাহা হানি হৈল ॥

—(চৈঃ চঃ—অন্ত্য, ১১শ পঃ)

তার পরদিন প্রাতঃকালে সকল ভক্ত সঙ্গে করিয়া প্রভু আসিলেন। হরিদাসকে ঘিরিয়া নামসংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। রামানন্দ, সার্ব্বভৌম প্রভৃতিকে প্রভু হরিদাসের গুণের কথা বলিতে লাগিলেন। সকল ভক্ত হরিদাসের চরণ বন্দনা করিল।—

হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রভুরে বসাইলা।
নিজ নেত্র দুই ভৃঙ্গ মুখপদ্মে দিলা ॥

স্বহৃদয়ে আনি ধরিল প্রভুর চরণ।
সর্ব্ব ভক্ত পদরেণু মস্তকে ভূষণ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শব্দ বলে বার বার।
প্রভু মুখমাধুরী পিয়ে নেত্রে জলধার॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম করিতে উচ্চারণ।
নামের সহিত প্রাণ করিল উৎক্রমণ॥

তারপর—

হরিদাসের তনু প্রভু কোলে উঠাইয়া।
অঙ্গনে নাচেন প্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া॥

পরে—

হরিদাস ঠাকুরে তবে বিমানে চড়াইয়া।
সমুদ্রে লইয়া গেল কীর্ত্তন করিয়া॥

বাঙালীর সংকীর্ত্তন বুঝি সেইদিন সমুদ্রগর্জ্জনকেও স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিল।—

আগে মহাপ্রভু চলে নৃত্য করিতে করিতে,
পাছে নৃত্য করে বক্রেশ্বর ভক্তগণ সাথে।
হরিদাসে সমুদ্রজলে স্নান করাইলা,
প্রভু কহে সমুদ্র এই মহাতীর্থ হৈলা।
হরিদাস পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ,
হরিদাসের অঙ্গে দিল প্রসাদ চন্দন।
ডোর করার প্রসাদ বস্ত্র অঙ্গে দিলা,
বালুকার গর্ত্ত করি তাহে শোয়াইলা।
হরিবোল হরিবোল বলে গৌড় রায়,
আপন শ্রীহস্তে বালু দিল তার গায়।
তারে বালু দিয়া উপরে পিণ্ডা বান্ধাইল,
চৌদিকে পিণ্ডার মহা আবরণ কৈল।
তারে বেড়ি মহাপ্রভু কৈল কীর্ত্তন নর্ত্তন,
হরিধ্বনি কোলাহলে ভরিল ভুবন।

—(চৈঃ চঃ—অন্ত্য, ১১শ পঃ)

তারপরে সমুদ্রে স্নান করিয়া প্রভু সিংহদ্বারে আসিয়া নিজে আঁচল পাতিয়া হরিদাসের মহোৎসবের জন্য প্রসাদ ভিক্ষা চাহিলেন। এমন বিচলিত হইতে তাঁহাকে কখনও দেখা যায় নাই। নিজে আঁচল পাতিয়া তিনি কোনদিন ভিক্ষা করেন নাই।—

হরিদাসের মহোৎসবের জন্য মহাপ্রভু নিজে আঁচল পাতিয়া ভিক্ষা চাহিলেন

সিংহদ্বারে আসি প্রভু পসারির ঠাঞি।
আঁচল পাতিয়া প্রসাদ মাগিল তাথাঞি॥
হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসব তরে।
প্রসাদ মাগি ভিক্ষা দেহতো আমারে॥

—(চৈঃ চঃ—অন্ত্য, ১১শ পঃ)

স্বরূপ গোসাঞি প্রভুকে সরাইয়া দিয়া লোক দিয়া বিস্তর প্রসাদ বহন করাইয়া নিয়া চলিলেন। 'সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে প্রভু বসাইলা সারি সারি', নিজে পরিবেশন করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহা আর কোনদিন দেখি নাই।

মহাপ্রভুর শ্রীহস্তে অল্প না আইসে।
এক এক পাতে পঞ্চজনার ভোজ্য পরিবেশে॥

—(চৈঃ চঃ—অন্ত্য, ১১শ পঃ)

তারপর মহাপ্রভু ভক্তমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

হরিদাসের বিজয়োৎসব যে কৈল দর্শন।
যে তাহা নৃত্য কৈল যে কৈল কীর্ত্তন॥
যে তারে বালুকা দিতে করিলা গমন।
তার মহোৎসবে যেই করিলা ভোজন॥
অচিরে তা সভাকার হবে কৃষ্ণ প্রাপ্তি।
হরিদাস দরশনে ঐছে হয় শক্তি॥
কৃপা করি কৃষ্ণ মোর দিয়াছিল সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা কৈলা সঙ্গ ভঙ্গ॥

হরিদাসের ইচ্ছা যবে হইল চলিতে।
আমার শকতি তারে নারিল রাখিতে॥
ইচ্ছামাত্র কৈল নিজ প্রাণ নিষ্ক্রমণ।
পূর্ব্বে যেন শুনিয়াছি ভীষ্মের মরণ॥
হরিদাস আছিল পৃথিবীর শিরোমণি।
তাহা বিনা রত্নশূন্য হইল মেদিনী॥

—(চৈঃ চঃ—অন্ত্য, ১১শ পঃ)

বাঙলার বিংশ শতাব্দীর বৈষ্ণব কান পাতিয়া মহাপ্রভুর এই সম্ভাষণ শোন, আর ষোড়শ শতাব্দীর মহাপ্রভুর ধর্ম্মে বাঙালীর 'সে বজ্র নির্ঘোষে কি ছিল বারতা' নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা কর।

শ্রীপাদ নিত্যানন্দপ্রভু

[জন্ম—১৪৭৮ খৃঃ ॥ মৃত্যু—১৫৪৫ খৃঃ ॥ ৬৮ বৎসর]

॥ শ্রীপাদ নিত্যানন্দপ্রভু ॥

"শ্রীপাদ, তোমার গৌড়রাজ্যে কারো নাহি অধিকার।"

শ্রীপাদ নিত্যানন্দপ্রভু তখন বৃন্দাবনে। সেইখান হইতেই শুনিতে পাইলেন যে, নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র 'প্রকাশ' হইয়াছেন।—

এই মত বৃন্দাবনে বৈসে নিত্যানন্দ।
নবদ্বীপে প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র ॥

—(চৈঃ ভাঃ—মধ্য, ৩য় অঃ)

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম প্রভাত

ষোড়শ শতাব্দীর তখন প্রথম প্রভাত। নবদ্বীপের টোলের খ্যাতি তখন সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহা সেই যুগ—যখন স্মার্ত্ত রঘুনন্দন বাঙালী হিন্দুর সামাজিক জীবনকে নিয়মিত ও শৃঙ্খলিত করিবার জন্য 'অষ্টবিংশতিতত্ত্ব' লিখিতেছেন। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ তন্ত্র শাস্ত্রের বহু বিভিন্ন শাখাকে সংগ্রহ করিয়া 'বৃহৎতন্ত্রসার' প্রণয়ন করিতেছেন। রঘুনাথ প্রাচীন ন্যায় ভাঙ্গিয়া, মিথিলার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া নব্যন্যায় দর্শন সৃষ্টি করিতেছেন। গৌড়ে তখন হোসেন শা'র রাজত্বকাল। বাঙলার এই যুগটাকে হুসেনী যুগও বলা যায়, বিশেষতঃ বাঙলা সাহিত্যের দিক হইতে। হোসেন শা' নিজে উৎসাহ দিয়া রামায়ণ, জৈমিনি ভারত প্রভৃতি বাঙলায় অনুবাদ করাইতেছেন। সঞ্জয়, কবীন্দ্র, শ্রীকর নন্দী প্রভৃতি অনুবাদকারিগণ হোসেন শা'র দরবারে পুরন্দর খান, গুণরাজ খান প্রভৃতি মুসলমানী উপাধি পাইতেছেন। হোসেন শা' নিজে বৈষ্ণবের পঞ্চরসের তত্ত্ব শুনিয়াছেন ও জানিয়াছেন।—

শ্রীযুত হুসন, জগৎ ভূষণ, সোহ এ রস জান।
পঞ্চ গৌড়েশ্বর, ভোগ পুরন্দর, ভণে যশোরাজখান ॥

—(সাহিত্য পঃ পত্রিকা—১৩০৬ সন, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৮)

মালাধর বসু বাঙলায় ভাগবতের অনুবাদ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণবিজয় ভাগবতের অনুবাদ হইলেও, ইহাতে রাধিকা আসিয়াছেন। ভাগবতে রাধিকা নাই, ব্রহ্মবৈবর্ত্তে আছে। মহাপ্রভু এই শ্রীকৃষ্ণবিজয় পরিণত অবস্থায়ও পাঠ করিতেন। যখন রাজ্যমধ্যে বাঙালী সভ্যতার সমস্ত দিকে এমনি একটা তুমুল আলোড়ন চলিতেছে, সেই সময় নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র প্রকাশ হইলেন। সভ্যতার অন্যান্য দিকগুলি হইতে খণ্ডিত হইয়া, বিচ্ছিন্ন হইয়া গৌরচন্দ্র প্রকাশ হইলেন না। সমগ্র বাঙ্গালী সভ্যতাটাই যখন একটা নব কলেবর গ্রহণ করিতেছে, সেই এক অখণ্ড বিরাট আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত হইয়া সেই মহা জাগরণকে আশ্রয় করিয়া গৌরচন্দ্র প্রকাশ হইলেন ষোড়শ শতাব্দীর নূতন যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তনকারী, সংকীর্ত্তনবিহারী নেতারূপে—অবতাররূপে।

পরম উদ্ধত, মহাতার্কিক নিমাই পণ্ডিত টোলে ছাত্রদের ব্যাকরণ পড়াইতেন। ব্যাকরণের স্বতন্ত্র একখানি টীকাও তিনি করিয়াছেন। অলঙ্কার, কাব্য, দর্শন প্রভৃতি অন্যান্য শাস্ত্রেও তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য। কেহই তাঁহার সঙ্গে তর্কে আঁটিয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু হইলে কি হয়, তিনি গয়া হইতে মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য পরম কৃষ্ণভক্ত ঈশ্বর পুরীর নিকটে দশাক্ষর গোপীনাথ মন্ত্র গ্রহণ করিয়া নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিয়া টোল ছাড়িয়া দিলেন। আর ছাত্র পড়াইবেন না। জ্ঞানপথ ছাড়িয়া ভক্তিপথে তাঁহার খুব মতি হইয়াছে। তিনি কৃষ্ণনাম প্রচার করিতেছেন। আর তর্ক করেন না। শ্রীবাসের বাড়ীতে রুদ্ধদ্বারে সংকীর্ত্তনের মহড়া চলিতেছে। নবদ্বীপের বৈষ্ণবেরা একত্র হইয়াছেন। নবদ্বীপের বাহিরে যাঁহারা পণ্ডিত, অথচ ভক্ত বৈষ্ণব, তাঁহারাও একে একে আসিতেছেন। রীতিমত একটা দল গঠন হইতেছে। লোক সংগ্রহ চলিতেছে। একটা নূতন ধর্ম্ম প্রচারের জন্য যা যা আন্দোলন দরকার, তা সমস্তই পুরাদমে চলিতেছে। চারিদিকে সংবাদ রটিয়া গিয়াছে। এই সংবাদ নবদ্বীপ হইতে অতিদূর বৃন্দাবনেও গিয়াছে। নতুবা নিত্যানন্দ শুনিবেন কিরূপে?

গৌরচন্দ্র প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে বাঙলা দেশের বিভিন্ন স্থানে অনেক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহারা গৌরচন্দ্রের জন্মের পূর্ব্বেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্য; বুড়নে যবন হরিদাস; শ্রীহট্টে শ্রীরাম পণ্ডিত, শ্রীবাস, শ্রীচন্দ্রশেখর দেব, মুরারি গুপ্ত; চট্টগ্রামে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ও মুকুন্দ—"একসঙ্গে মুকুন্দের জন্ম চাটিগ্রামে"— (চৈঃ ভাঃ)।

গৌরচন্দ্র প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে বাঙলাদেশের বিভিন্ন স্থানে অনেক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ছিলেন

চৈতন্য বল্লভ দত্ত—

রাঢ়ে একচক্রা গ্রামে নিত্যানন্দ।
শ্রীচন্দ্রশেখর, জগদীশ, গোপীনাথ।
শ্রীমান, মুরারি, শ্রীগরুড়, গঙ্গাদাস ॥
—(চৈঃ ভাঃ)

ইঁহারা সকলেই আগে জন্মিয়াছেন।—

পূর্ব্বেই জন্মিলা সভে ঈশ্বর আজ্ঞায়।
—(চৈঃ ভাঃ)

বৈষ্ণব বলিয়া ইঁহাদের মধ্যে একটা বান্ধব ব্যবহার ছিল। কিন্তু কে কোন্ অবতার, তা কেহই জানিতেন না।—

সভে করে সভারে বান্ধব ব্যবহার।
কেহ কারো না জানেন নিজ অবতার ॥
—(চৈঃ ভাঃ)

গৌরচন্দ্র কৃষ্ণের অবতার না-হওয়া পর্য্যন্ত পারিষদগণ কে কোন্ অবতার হইবেন, ঠিক হয় নাই। যদি গৌরচন্দ্র অবতার না-হইতেন, প্রকাশ না-হইতেন, তবে হয়তো ইঁহারা কেহই কোন অবতার হইতেন না। যে যেমন তেমনি থাকিতেন—পঞ্চদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণবেরা যেমন একা একা অবতার না-হইয়া থাকিয়া গিয়াছেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতেও বাঙলায় বৈষ্ণব ছিল। গৌরচন্দ্রের অবতারত্বের সঙ্গে

মিলাইয়া সঙ্গিগণের মধ্যে যার যে রকম চরিত্র, তদনুযায়ী অবতারত্ব আরোপ হইয়াছে। কেবল গৌরচন্দ্র কৃষ্ণের অবতার হন নাই—নূতন ধর্ম্ম প্রচারের জন্য সমগ্র কৃষ্ণলীলাই সাঙ্গোপাঙ্গের উপর আরোপিত হইয়াছিল। সঙ্গীদের মধ্যে বৃন্দাবন-লীলার অবতার ছাড়া প্রায় কেহই ছিলেন না। দলের উপর বৃন্দাবন-লীলা আরোপ করাইয়া তবে প্রচার আরম্ভ হয়।

গৌরচন্দ্র প্রকাশের পূর্ব্বে বৈষ্ণবগণ প্রায় একা একাই থাকিতেন। দল গঠন হয় নাই।—

আপনা আপনি সভে করেন কীর্ত্তন।
—(চৈঃ ভাঃ)

অদ্বৈতের সভায় কেহ কেহ আসিয়া কৃষ্ণকথা বলিতেন। শ্রীবাসাদি চারি ভাই রাত্রি হইলে—দিনে পারিতেন না—উচ্চৈঃস্বরে হরিনামও করিতেন।—এই পর্য্যন্ত।

বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের প্রয়োজন আচার্য্য অদ্বৈত ও যবন হরিদাস—সর্ব্বপ্রথমে এই দুইজনেই বিশেষ করিয়া ভাবিতেন। কিন্তু কেহই প্রচার আরম্ভ করিতে সাহসী হন নাই। কেন? কেন তাঁহারা প্রচার আরম্ভ করিতে সাহস করেন নাই? পরে তাঁহারাই ত প্রচার করিয়াছেন!

একটি বস্তুর অভাব ছিল। তাহা গৌরচন্দ্রের প্রকাশ। বাঙালীর ষোড়শ শতাব্দীর প্রচার এই নেতৃত্ব—এই প্রকাশের অপেক্ষা করিতেছিল। গৌরচন্দ্রের প্রকাশ ব্যতিরেকে হয়তো এই প্রচার সম্ভব হইত না। এইখানে শ্রীচৈতন্য-চরিত্রের বিশেষত্ব ও গুরুত্ব। এইখানে, গৌরচন্দ্রের প্রকাশ একটা ঐতিহাসিক প্রয়োজন—যার জন্য যবন হরিদাস নির্জ্জন গোঁফায় বসিয়া নামকীর্ত্তন করিতেছিলেন, শ্রীঅদ্বৈত জলতুলসী দিয়া বিধিমত পূজা করিতেছিলেন। অকস্মাৎ কিছু হয় নাই। রীতিমত চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। ইতিহাসে অকস্মাৎ, বিনা কারণে কিছু হয় না। ইতিহাসের ঘটনার অন্তরালে

সেই সমস্ত কারণ অনুসন্ধান করাই এযুগের তপস্যা। ইতিহাসের ঘটনাগুলির কারণ যিনি জানেন না, তিনি ইতিহাস জানেন না। বাঙালীর বৈষ্ণবধর্ম্ম ইতিহাসের একটি বড় ঘটনা। এত বড় যে, ইহার সমতুল্য ঘটনা গত ৫০০ বৎসরে বাঙলা দেশে আর ঘটে নাই। এবং এত বড় ঐতিহাসিক ঘটনার কারণ ইতিহাসেই আছে। নিত্য লীলা হইতে ইহা প্রকট হইয়াছে—তা হউক। কিন্তু প্রাকৃতের কারণ প্রাকৃতের মধ্যেই যে-পরিমাণে পাওয়া যায়, প্রাচীন বা নবীন বৈষ্ণবগণ তাহা অনুসন্ধানে একান্তই বিমুখ। কেবল নিত্য বা অপ্রাকৃতের উপর বরাত দিয়া প্রাকৃত ঘটনার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে চলে, বিংশ শতাব্দীতে চলে না। আর যদি চলে, তবে নব্যন্যায়ের উদ্ভাবনকারী যে জাতি, তার বুদ্ধিকে অপমান করা হয়।

বৃন্দাবনে নিত্যানন্দ, নবদ্বীপে গৌরচন্দ্রের প্রকাশ শুনিলেন।—

নিত্যানন্দ জানিলেন প্রভুর প্রকাশ।

—(চৈঃ ভাঃ)

জানিয়া তিনি কী করিলেন

নিত্যানন্দের নবদ্বীপ আগমন

জানিঞা আইলা ঝাট নবদ্বীপপুরে
আসিয়া রহিলা নন্দন আচার্য্যের ঘরে॥

—(চৈঃ ভাঃ)

তখন নিত্যানন্দের বয়স ৩২ বৎসর। মহাপ্রভুর বয়স ২৩ বৎসর মাত্র। নিত্যানন্দপ্রভু, মহাপ্রভু হইতে ৮ বৎসরের বড়। ইহা ১৫০৯ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। ইতিহাসের এত বড় একটা দুঃসাহসিক কার্য্যে, নিমাইয়ের মত এত অল্প বয়সের একজন যুবককে নেতা হইতে আর দেখা যায় না। বাঙলায় তো হয়ই নাই, অন্য দেশেও না।

প্রভু নিত্যানন্দ ত নবদ্বীপ আসিলেন। এখন অতি সংক্ষেপে তাঁহার ৩২ বৎসর [illegible] একটা গতি ও পরিণতি লক্ষ্য করা যাক্। নবদ্বীপ আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইবার পূর্ব্বে

এই ৩২ বৎসর তিনি কী করিয়াছেন, তাহা না-জানিলে তাঁহার সম্বন্ধে কোন সঙ্গত ধারণায় পৌঁছা যাইবে না।

লুপলাইনে বল্লভীপুর ষ্টেশনের নিকট বীরভূম জেলায় একচাকা গ্রামে ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে মাঘী শুক্ল ত্রয়োদশী তিথিতে নিত্যানন্দ জন্মগ্রহণ করেন।—

জন্ম

রাঢ়ে অবতীর্ণ হইলা নিত্যানন্দ রাম,
মাঘ মাসে শুক্লা ত্রয়োদশী শুভদিনে,
পদ্মাবতী গর্ভে একচাকা নামে গ্রামে,
হাড়াই পণ্ডিত নামে শুদ্ধ বিপ্ররাজ॥

—(চৈঃ ভাঃ—আদি, ২য় অঃ)

নিত্যানন্দের পিতা—

হাড়ো ওঝা নামে পিতা, মাতা পদ্মাবতী।
একচাকা নামে গ্রাম মৌড়েশ্বর যথি।

—(চৈঃ ভাঃ—আদি, ২য় অঃ)

নিত্যানন্দের পিতা রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। তবে কৃষিকর্ম্মও করিতেন। ব্রাহ্মণের কৃষিকর্ম্ম করা তখন দোষের ছিল না। অনেক ব্রাহ্মণের তখন যজমানবৃত্তির সঙ্গে কৃষিকর্ম্মও জীবিকা ছিল। চাকুরিজীবী ব্রাহ্মণ অষ্টাদশ শতাব্দীতেও কম। ঊনবিংশ শতাব্দী হইতেই ইহার প্রচলন। ব্রাহ্মণের পক্ষে চাকুরী করা, বিশেষতঃ রাজসেবক, রাজার চাকুরী করা—ভাল কথা ছিল না। উহাতে নিন্দা ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহারাজ নন্দকুমারের মাতৃশ্রাদ্ধেও এমন ব্রাহ্মণ বাঙলায় ছিল—যাঁহারা আসেন নাই, খান নাই। কেননা, তিনি নবাব মিরজাফরের চাকুরী করিতেন। রায় রামানন্দ, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতনের মত বড় বড় রাজকর্ম্মচারী রাজসরকারে চাকুরীর জন্য নিজেকে হীন মনে করিতেন।

হাড়াই ওঝা—

কিবা কৃষি কর্ম্মে, কিবা যজমান ঘরে।
কিবা হাটে, কিবা ঘাটে যত কর্ম্ম করে॥

—(চৈঃ ভাঃ)

সর্ব্বদাই ব্রাহ্মণ চিন্তিত থাকিত, পাছে পুত্র সন্ন্যাস লইয়া গৃহত্যাগী হয়।—হইলও তাই।

"দৈবে একদিন এক সন্ন্যাসী সুন্দর" আসিলেন। এবং নিত্যানন্দের পিতার নিকট হইতে বালক নিত্যানন্দকে ভিক্ষা করিয়া কিছুদিনের জন্য সঙ্গে নিলেন। সন্ন্যাসী তীর্থ পর্য্যটনে যাইবেন। সঙ্গে ভাল ব্রাহ্মণ নাই।—এই জন্য।

সন্ন্যাসী বলে,—'করিবাঙ্ তীর্থ পর্য্যটন।
সংহতি আমার ভাল নাহিক ব্রাহ্মণ॥
প্রাণ অতিরিক্ত আমি দেখিব উহানে।
সর্ব্ব তীর্থ দেখিবেন বিবিধ বিধানে॥'

—(চৈঃ ভাঃ)

তীর্থে তীর্থে সন্ন্যাসীর পরিচর্য্যা করিবার জন্য বালক নিত্যানন্দ—তখন নাম ছিল কুবের, আর বয়স ছিল মাত্র ১২—গৃহত্যাগী হইলেন। ১২ বৎসরে যতদূর সম্ভব তার অধিক লেখাপড়া নিত্যানন্দ শিখিতে পারেন নাই। ভক্তিরত্নাকর বলেন—১২ বৎসর বয়সেই বালক নিত্যানন্দকে ১৬ বৎসরের মত দেখাইত, এবং সেই বয়সেই হাড়াই ওঝা পুত্রের বিবাহের উদ্যোগ পর্য্যন্ত করিতেছিলেন।

অনেকের ধারণা—চৈতন্যদেবের বড় ভাই বিশ্বরূপ যখন সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করেন, তখন তিনিই বালক নিত্যানন্দকে সঙ্গে নিয়া যান। চৈতন্যের অগ্রজ বিশ্বরূপই এই সন্ন্যাসী। কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থে ইহার কোন প্রমাণ নাই। প্রমাণাভাবে ইহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। যেসব উপগ্রন্থে ইহা আছে তাহা অপ্রামাণিক। ছাপার অক্ষরে সমস্ত গ্রন্থই কিছু প্রামাণ্য নহে।

নিত্যানন্দ ১২ বৎসর বয়সে সন্ন্যাসীর চেলা হইয়া গৃহত্যাগ করেন। ২০ বৎসর ভারতের সকল তীর্থে ভ্রমণ ও বাস করিয়া অতিবাহিত করেন। ২০ বৎসর বাড়ী ফিরেন নাই। উল্লেখ নাই—কোথাও। বিবাহ না-করিয়া ২০ বৎসর একাদিক্রমে এই বৃহৎ দেশের তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া ৩২ বৎসর বয়সে তাঁহার জীবনে যে অভিজ্ঞতা, যে বহুদর্শিতা, যে উদারতা সঞ্চিত হইয়াছিল—নবদ্বীপের কোন এক বিশেষ সংকীর্ণ টোলে, কোন এক বিশেষ শাস্ত্র এতদিন ধরিয়া পড়িলে, বুদ্ধি ও চরিত্র যেরূপে গঠিত হইত, নিত্যানন্দ-চরিত্রে তাহা হয় নাই। বহু বৎসর ব্যাপী বহুদেশ ভ্রমণজনিত নিত্যানন্দ-চরিত্রে কূপমণ্ডুকতা বাল্য হইতেই প্রশ্রয় পায় নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের বিদ্যা ও পাণ্ডিত্য নিত্যানন্দে ছিল না। চৈতন্যদেব ছিলেন টোলের ছাত্র—টুলো পণ্ডিত, যুবক, ব্রাহ্মণ, অভিমানী, দাম্ভিক, উদ্ধত, তার্কিক অথচ অসাধারণ পণ্ডিত। নিত্যানন্দ টোলে পড়েন নাই, পড়ান নাই; বিদ্যা বা পাণ্ডিত্যের খ্যাতি নাই, সুযোগও ঘটে নাই। কিন্তু তিনি বহুদর্শী, তিনি একজন ইতিহাসবরেণ্য বিখ্যাত ভ্রমণকারী—পরিব্রাজক। ভারত পর্য্যটকদের মধ্যে, ষোড়শ কেন অদ্যাপি তিনি অগ্রণী। মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ে এত বড় পর্য্যটক ও বহুদর্শী আর কেহই ছিলেন না। ঈশাননাগর আচার্য্য অদ্বৈতকে দিয়াও অনেক তীর্থ পর্য্যটন করাইয়াছেন সত্য—কিন্তু এতটা নহে। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ তখন সন্ন্যাসী—বিবাহ করেন নাই। শ্রীচৈতন্যদেব দুই দুইবার বিবাহ করিয়াছেন—মা আছেন, স্ত্রী আছেন, উত্তম গৃহস্থ। নিত্যানন্দের বাড়ী নাই, ঘর নাই। মহাপ্রভুর সব আছে। নিত্যানন্দ উদার, ক্ষমাশীল, অবধূত অর্থাৎ সর্ব্বসংস্কারমুক্ত এবং পরম দয়াল। চৈতন্যদেব তা নহেন—নিত্যানন্দের সমতুল্য তো নিশ্চয়ই নহেন। মহাপ্রভু পুঁথি বেশী পড়িয়াছেন, তর্ক বেশী করিয়াছেন। নিত্যানন্দ-

১২ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ—২০ বৎসর ভারতের সকল তীর্থে ভ্রমণ

শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ও শ্রীচৈতন্য চরিত্রের তুলনা

প্রভু দেশ বেশী দেখিয়াছেন, মানুষ বেশী চিনিয়াছেন। সমস্ত ভারতবর্ষের সকল শ্রেণীর লোককে ২০ বৎসর একাদিক্রমে যিনি একটা উদ্দেশ্য লইয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহার মানসিক বিকাশ ও পরিণতির ইতিহাস বাঙলা সাহিত্যে আজিও লিখিত হয় নাই। অপ্রাকৃতের মোহে পড়িয়া বৈষ্ণব লেখকগণ এই অতি বড় প্রয়োজনীয় প্রাকৃতের ইতিহাসটি উপেক্ষাই করিয়াছেন। নিত্যানন্দের ২০ বৎসর ব্যাপী ভারতভ্রমণ একনিঃশ্বাসে, প্রাচীন পুঁথির এক পাতাতেই নিঃশেষ হইয়া যায়। কিন্তু তা যাওয়া উচিত নয়।

চৈতন্যভাগবতকার বৃন্দাবনদাস, শ্রীপাদ নিত্যানন্দের নিকট সমস্তই শুনিয়াছিলেন। তিনিও তীর্থের নামগুলির মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন।—ইহা যথেষ্ট নয়। বাঙলার সর্ব্বপ্রধান সমাজ-সংস্কারক এবং সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী প্রচারকের মানসিক বিকাশের ইতিহাস, এই ২০ বৎসরের অন্ধকারে লুক্কায়িত। বৈষ্ণব এবং অ-বৈষ্ণব, সকলেরই ইহা অনুসন্ধানের বিষয়।—

> হেন মতে দ্বাদশ বৎসর থাকি ঘরে।
> নিত্যানন্দ চলিলেন তীর্থ করিবারে॥
> তীর্থযাত্রা করিলেন বিংশতি বৎসর।
> তবে শেষ আইলেন চৈতন্য গোচর॥
>
> —(চৈঃ ভাঃ)

চৈতন্যের গোচরে আসিবার পূর্ব্বে তিনি এক বৃহৎ জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, যাহা আর কেহ করেন নাই। মহাপ্রভু নিজেও নয়। চৈতন্যভাগবতের ক্রম অনুসারে নিত্যানন্দ (ক) প্রথমে গেলেন বক্রেশ্বর; পরে—বৈদ্যনাথ, কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন, হস্তিনাপুর। (খ) তারপর—দ্বারকা, সিদ্ধপুর, মৎস্যতীর্থ, শিবকাঞ্চী, বিষ্ণুকাঞ্চী, কুরুক্ষেত্র, পৃথুদক, বিন্দুসরোবর, প্রভাস। (গ) ত্রিতকূপ, ব্রহ্মতীর্থ, চক্রতীর্থ, প্রতিস্রোতা, নৈমিষ-অরণ্য,

তীর্থ ভ্রমণের নাম ও ক্রম নির্দ্দেশ

অযোধ্যা, পুলহ-আশ্রম, গোমতী, গণ্ডকী, শোণ, মহেন্দ্র পর্ব্বত; শেষ—হরিদ্বার। (ঘ) পম্পা, ভীমরসী, বেন্বাতীর্থ, শ্রীপর্ব্বত। (ঙ) তবে নিত্যানন্দপ্রভু দ্রাবিড়ে গেলেন।—বেঙ্কটনাথ, কামকোষ্ঠী-পুরী, কাঞ্চী সরিদ্বরা, কাবেরী, শ্রীরঙ্গনাথ, হরিক্ষেত্র, ঋষভপর্ব্বত, তাম্রপর্ণী, মলয়পর্ব্বত, বদরিকাশ্রম……এখানে।

এখানে—

কথোদিন নরনারায়ণের আশ্রমে
আছিলেন নিত্যানন্দ পরম নির্জ্জনে॥

কেবল ঘুরিয়া বেড়ান নাই। পরম নির্জ্জনেও মাঝে মাঝে বাস করিয়াছেন। তিনি অবধূত, তিনি যোগী। তাঁহার দেশভ্রমণ একটা বিলাস নয়, খেয়াল নয়, বায়ুপরিবর্ত্তন নয়, উদ্দেশ্যহীনও নয়। বাঙলার ষোড়শ শতাব্দীর ধর্ম্মপ্রচারের যে প্রকাণ্ড মহীরুহ, তাহা এই সময়ে বীজ হইতে তাঁহার মধ্যে অঙ্কুরিত হইতেছিল।

(চ) তারপরে গেলেন ব্যাসের আলয়। সেখান হইতে—

তবে নিত্যানন্দ গেলা বৌদ্ধের ভবন।
দেখিলেন প্রভু বসি আছে বৌদ্ধগণ॥
জিজ্ঞাসেন প্রভু কেহ উত্তর না করে।
ক্রুদ্ধ হই প্রভু লাথি মারিলেন শিরে॥
পলাইল বৌদ্ধগণ হাসিয়া হাসিয়া।
বনে ভ্রমে নিত্যানন্দ নির্ভয় হইয়া॥

—(চৈঃ ভাঃ)

বৌদ্ধদের মাথায় নিত্যানন্দ লাথি মারিলেন—ইহা বিশ্বাস হয় না। মাথায় লাথি মারা—যে-কোন উত্তম বা অধম কারণের জন্যই হউক, বৃন্দাবনদাসের একটা মুদ্রাদোষ। চৈতন্য ভাগবতের পাঠকমাত্রই তাহা অবগত আছেন। নিত্যানন্দ প্রভুর সাক্ষাৎশিষ্য হইলেও বৃন্দাবনদাস ক্রোধী ব্যক্তি ছিলেন। নিজের অ-প্রাকৃত জন্মবৃত্তান্তের জন্য যেরূপ অভদ্র আলোচনা তাঁহাকে আশৈশব শুনিতে হইয়াছে,

সম্ভবতঃ সেইজন্যই তাঁহার স্বভাব তিক্ত ও বিরক্ত হইয়া গিয়াছে। তিনি এবং তাঁহার মাতা নারায়ণী নবদ্বীপ হইতে একরূপ নির্ব্বাসিত ছিলেন। অবশ্য দয়াল নিত্যানন্দের শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই এইরূপ ছিলেন।

(ছ) তারপর নিত্যানন্দ আসিলেন—কন্যকানগর, দক্ষিণসাগর, শ্রীঅনন্তপুর, পঞ্চ-অপ্সরা-সরোবর, গোকর্ণাখ্য, কেরল, মাহিষ্মতীপুরী, …'সূর্পারক দিয়া প্রভু প্রতিচী চলিলা'। বনে ভ্রমণ করিতে করিতে—

দৈবে মাধবেন্দ্রসহ হৈল দরশন।

* * *

মাধবেন্দ্রপুরী দেহে কৃষ্ণের বিহার
যার শিষ্য মহাপ্রভু আচার্য্য গোসাঞি।
ভক্তিরসে আদি মাধবেন্দ্র সূত্রধার,
গৌরচন্দ্র ইহা কহিয়াছেন বার বার।

—(চৈঃ ভাঃ)

নিত্যানন্দের সহিত মাধবেন্দ্রপুরীর সাক্ষাৎ—একটি বড় ঘটনা। অনুমান অসঙ্গত হইবে না যে, মাধবেন্দ্রপুরী হইতেই নিত্যানন্দে কৃষ্ণভক্তি সংক্রমিত হয়। মহাপ্রভু গয়া যাইবার পূর্ব্বে নবদ্বীপে ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর, ঈশ্বরপুরীর কৃষ্ণবিষয়ক গ্রন্থ আলোচনান্তে মহাপ্রভুতে কৃষ্ণভক্তি যেরূপ সংক্রমিত হইয়াছিল—

মাধবেন্দ্রপুরী

সেইরূপ মাধবেন্দ্রপুরী দ্বারা নিত্যানন্দপ্রভুর এইরকম হওয়াটা আশ্চর্য্য ত নয়-ই, বরং খুব স্বাভাবিক। শ্রীঅদ্বৈতও মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ছিলেন। তাহা হইলে দাঁড়ায় এই যে : শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ও চৈতন্যদেব —ইঁহাদের প্রথম দুইজন সাক্ষাৎ মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য; আর তৃতীয় জন মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য যে ঈশ্বরপুরী, তাঁর শিষ্য। এই মাধবেন্দ্রপুরী ষোড়শ শতাব্দীর ভক্তিধর্ম্মের আদি সূত্রধার। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি না-কি শূদ্র ছিলেন। কিন্তু শূদ্রের সন্ন্যাস ত তখন বিধিসঙ্গত ছিল না—বিশেষতঃ দশনামী সম্প্রদায়ে।—

মাধবপুরীরে দেখিলেন নিত্যানন্দ।
ততক্ষণে প্রেমে মূর্চ্ছা হইলা নিস্পন্দ।
নিত্যানন্দ দেখি মাত্র শ্রীমাধবপুরী।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হই আপনা পাসরি॥

* * *

মাধবেন্দ্র কথা অতি অদ্ভুত কথন।
মেঘ দেখিলেই মাত্র হয় অচেতন॥

—(চৈঃ ভাঃ)

চণ্ডীদাসের রাধিকা, মহাপ্রভুর শেষ ১২ বৎসরের দিব্যোন্মাদ ও কৃষ্ণকমলের রাই উন্মাদিনী—মাধবেন্দ্রের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। মাধবেন্দ্রপুরীর সহিত নিত্যানন্দের যে-সব কথা হইয়াছিল—বৃন্দাবনদাস তা সবিস্তারে লেখেন নাই। তবে অনেক কথা যে হইয়াছিল, তার আভাস পাওয়া যায়।—

মাধবেন্দ্র সঙ্গে যত হইল আখ্যান।
কে জানয়ে তাহা কৃষ্ণচন্দ্র সে প্রমাণ॥
মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দ ছাড়িতে না পারে।
নিরবধি নিত্যানন্দ সংহতি বিহরে॥

—(চৈঃ ভাঃ)

বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন যে—মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দকে বন্ধুর মত দেখিতেন, আর নিত্যানন্দ মাধবেন্দ্রকে গুরুর মত দেখিতেন। মাধবেন্দ্র বলিতেছেন—

নিত্যানন্দ হেন বন্ধু পাইলুঁ সংহতি।

—(চৈঃ ভাঃ)

আবার—

মাধবেন্দ্র প্রতি নিত্যানন্দ মহাশয়।
গুরু বুদ্ধি ব্যতিরিক্ত আর না করয়॥

—(চৈঃ ভাঃ)

মাধবেন্দ্রকে ছাড়িয়া নিত্যানন্দ আবার ভ্রমণে চলিলেন। মাধবেন্দ্র গেলেন 'সরযূ দেখিবারে'; নিত্যানন্দ আসিলেন—(জ) সেতুবন্ধ, রামেশ্বর, বিজয়ানগর, মায়াপুরী, অবন্তী, ত্রিভড়নৃসিংহ, দেবপুরী, ত্রিমল্ল, কূর্ম্মনাথ…পরে, নীলাচলে পুরী তীর্থে। মহাপ্রভুর বহু পূর্ব্বে নিত্যানন্দপ্রভু পুরী গিয়াছিলেন। পুরী কিছুদিন ছিলেন। পরে—পুরী হইতে গেলেন গঙ্গাসাগর। গঙ্গাসাগর হইতে পুনরায়—মথুরা ও বৃন্দাবন।

নিত্যানন্দের এই তীর্থযাত্রার ক্রম বৃন্দাবনদাস, নিত্যানন্দপ্রভুর নিকট শুনিয়া লিখিয়াছেন।—

তান তীর্থযাত্রা সব কে পারে কহিতে।
কিছু লিখিলাম মাত্র তাঁর কৃপা হইতে॥
—(চৈঃ ভাঃ)

এইবার গৌরচন্দ্রের 'নবদ্বীপে প্রকাশ' শুনিয়া নিত্যানন্দপ্রভু নবদ্বীপ আসিলেন (১৫০৯, জুন শেষ অথবা জুলাইয়ের প্রথম)।

নিত্যানন্দের নবদ্বীপ আগমন

নন্দন আচার্য্যের ঘরে আসিয়া থাকিলেন। নিজে গিয়া গৌরচন্দ্রের সহিত দেখা করিলেন না। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহার পরেও গৌড় হইতে নীলাচলে গমনাগমনকালে, এই প্রথাই নিত্যানন্দ বহাল রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যকে নিত্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া গৌড় ও রাঢ়ে একাদিক্রমে ৩০ বৎসরের ঊর্দ্ধকাল (১৫১৬ খৃঃ—১৫৪৫ খৃঃ) প্রচার করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার নিজের সম্বন্ধে নিজের একটা সুস্পষ্ট ধারণা ছিল—কখনই তার ব্যতিক্রম করেন নাই।

নিত্যানন্দের আগমন শুনিয়া গৌরচন্দ্র—যবন হরিদাস ও শ্রীবাস পণ্ডিতকে লইয়া দেখিতে গেলেন। গৌরচন্দ্র বলিলেন—

চল হরিদাস চল শ্রীবাস পণ্ডিত।
চাহ গিয়া দেখি কে আইলা কোন ভিত॥
—(চৈঃ ভাঃ)

নন্দন আচার্য্যের ঘরে গিয়া—

সভে দেখিলেন—যেন কোটি সূর্য্যসম ॥
অলক্ষিত আবেশ বুঝন নাহি যায়।
ধ্যান সুখে পরিপূর্ণ, হাসয়ে সদায় ॥
মহাভক্তি যোগ প্রভু বুঝিয়া তাঁহার।
গণসহ বিশ্বম্ভর হইল নমস্কার ॥
সম্ভ্রমে রহিলা সর্ব্বগণ দাণ্ডাইয়া।
কেহ কিছু না বোলয়ে রহিল চাহিয়া ॥

নন্দন আচার্য্যের ঘরে নিত্যানন্দ ও শ্রীচৈতন্যের মিলন

*　　*　　*

নিত্যানন্দ সম্মুখে রহিলা বিশ্বম্ভর।
চিনিলেন নিত্যানন্দ আপন ঈশ্বর ॥
হরিষে স্তম্ভিত হৈলা নিত্যানন্দ রায়।
এক দৃষ্টি হই বিশ্বম্ভর রূপ চায় ॥
রসনায় লেহে যেন দরশনে পান।
ভুজে যেন আলিঙ্গন নাসিকায় ঘ্রাণ ॥
এইমত নিত্যানন্দ হইলা স্তম্ভিত।
না বোলে না করে কিছু সভেই বিস্মিত ॥

—(চৈঃ ভাঃ)

প্রথম মিলনেই দেখিতে পাই, দুইজনেই স্তব্ধ। একটা স্তম্ভিত ভাব। বড় সুন্দর বর্ণনা বৃন্দাবনদাস করিয়াছেন। যে প্রবল ঝটিকা কিছু পরে বাঙলার আকাশ ভেদিয়া উৎকল, দ্রাবিড়, মথুরা, বৃন্দাবনে ছড়াইয়া পড়িবে—এই স্তব্ধতা তাহার পূর্ব্বাভাস। এই মিলন এতদিন তাহারই প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিতেছিল। বিশ্বম্ভর পুলকে, সম্ভ্রমে নমস্কার করিল। ভাবিল—এই সেই। নিত্যানন্দও অবাক হইয়া অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়া দেখিল, আর ভাবিল—এই সেই। পারিবে কি? পারিবে?

শ্রীবাসের বাড়ীতে নিত্যানন্দের থাকিবার ব্যবস্থা হইল। শ্রীবাসকে পিতা ও মালিনীকে মাতা জ্ঞানে তিনি সেইখানে থাকিলেন।

এই ব্যবস্থা করিয়াই গৌরচন্দ্র তাঁহার নেতৃত্ব করিবার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিলেন।

প্রথমেই শ্রীঅদ্বৈতকে আনিবার জন্য রামাই পণ্ডিতকে শান্তিপুর পাঠাইলেন। শ্রীঅদ্বৈতকে পূজার সাজ লইয়া সস্ত্রীক আসিতে বলিয়া দিলেন। পরে যে-সমস্ত পারিষদ আসিয়া পৌঁছেন নাই, তাঁহাদেরও আনিতে পাঠাইলেন। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি মহাপণ্ডিত। বাহিরে অনেকটা রায় রামানন্দের মত বিলাসী লোক। অন্যে ভুল বুঝিত। যিনি নেতা, তিনি ভুল বুঝিলেন না। গদাধর পুণ্ডরীককে বিলাসী বলিয়া সন্দেহ করিত। গৌরচন্দ্র এই ভুল ভাঙ্গিয়া দিলেন। পুণ্ডরীকের নিকট গদাধরকে দীক্ষা দেওয়াইলেন।—ইহাই নেতৃত্ব।

শ্রীচৈতন্যের সংগঠন-শক্তি

শ্রীধর—মহাভক্ত। পণ্ডিত নয়—মূর্খ। কলাগাছের খোলা বেচিয়া খায়। মহাপ্রভু নিজে তাহাকে গিয়া লইয়া আসিলেন। দলভুক্ত করিলেন। পণ্ডিত ও মূর্খ—এক দলভুক্ত হইল। বিলাসী ও বিষয়-বিরক্ত—এক দলভুক্ত হইল।—ইহাই নেতৃত্ব।

তারপর মহাপ্রভুর শ্রীবাসের বাড়ীতে অভিষেক (১৫০৯ আগষ্ট)। মহাপ্রভুকে ১০৮ কলসী গঙ্গাজলে সকল ভক্ত মিলিয়া স্নান করাইল—অভিষেক হইল।—

শ্রীবাসের বাড়ীতে শ্রীচৈতন্যের অভিষেক

সর্ব্বাদ্যে শ্রীনিত্যানন্দ জয় জয় বলি।
প্রভুর শ্রীশিরে জল দেয় কুতূহলী॥
—(চৈঃ ভাঃ)

গোপীনাথ মন্ত্রে সকলে মহাপ্রভুর স্তব করিল। ইহার অর্থ কী? অর্থ—সর্ব্বসম্মতিক্রমে মহাপ্রভু বৈষ্ণব আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। সকলকে বর দিলেন—শ্রীঅদ্বৈতকেও দিলেন। দিলেন না—শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। নিত্যানন্দ বরদানের অনেক উর্দ্ধে। নিত্যানন্দের একখানি কৌপীন ছিঁড়িয়া

এক টুকরা করিয়া সকলকে বিতরণ করিলেন। নিত্যানন্দের পাদোদক সকল ভক্তকে খাওয়াইলেন। দলের মধ্যে নিত্যানন্দের স্থান নির্দিষ্ট হইল। নিমাই কৃষ্ণ হইলেন, নিতাই বলরাম হইলেন।

প্রভু শ্রীঅদ্বৈতের নিকট প্রতিজ্ঞা করিলেন—

ব্রহ্মা ভব নারদাদি যারে তপ করে।
হেন ভক্তি বিলাইমু বলিলু তোমারে॥
—(চৈঃ ভাঃ)

অদ্বৈত বলিলেন—

অদ্বৈত বোলেন—'যদি ভক্তি বিলাইবা।
স্ত্রী শূদ্র আদি যত মুর্খেরে সে দিবা॥
বিদ্যা ধন কুল আদি তপস্যার মদে।
তোর ভক্ত তোর ভক্তি যে যে জন বাধে॥
সে পাপীষ্ঠ সব দেখি মরুক পুড়িয়া।
চণ্ডাল নাচুক তোর নাম গুণ গ্যায়া॥
—(চৈঃ ভাঃ)

প্রভু উত্তর দিলেন—

অদ্বৈতের বাক্য শুনি করিলা হুঙ্কার।
প্রভু বলে সত্য যে তোমার অঙ্গীকার॥
—(চৈঃ ভাঃ)

নেতৃত্ব বা অবতার, যা-ই বলা হউক—প্রচারের জন্য। এই প্রচারের পাত্র—স্ত্রী, শূদ্র, মুর্খ। "চণ্ডাল নাচুক তোর নাম গুণ গ্যায়া"—প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য এই। মহাপ্রভু অঙ্গীকার করিলেন। অস্পষ্টতা কিছুই নাই। আচার্য্য অদ্বৈতের নিকট মহাপ্রভুর এই অঙ্গীকার পালন করিয়াছিলেন—শ্রীপাদ নিত্যানন্দপ্রভু। ইতিহাস তাহার সাক্ষী। এইখানেই সমগ্র বৈষ্ণব আন্দোলনের ইতিহাসে নিত্যানন্দ-চরিত্রের গুরুত্ব।

তারপর মহাপ্রভু হঠাৎ একদিন নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে সর্ব্ব-প্রথম প্রচারে পাঠাইলেন (১৫০৯ আগষ্ট প্রথমে) ।—

নিত্যানন্দ ও হরিদাস প্রথম প্রচারক

একদিন আচম্বিতে হৈল হেন মতি।
আজ্ঞা কৈল নিত্যানন্দ হরিদাস প্রতি॥
শুন শুন নিত্যানন্দ, শুন হরিদাস।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ বোল, কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥
—(চৈঃ ভাঃ—মধ্য, ১৩শ অঃ)

আর তোমরা, যাহারা বলিলেও না-শুনিবে—

তবে আমি চক্রহস্তে সবারে কাটিমু।
—(চৈঃ ভাঃ—মধ্য, ১৩শ অঃ)

যেসকল পাষণ্ডী এই প্রচারে বিরোধী হইবে, কৃষ্ণের অবতার নিমাই সবারে চক্রহস্তে কাটিবেন।

ব্রাহ্মণ ও মুসলমান—এই দুই প্রচারক একসঙ্গে যেদিন বাঙালীর ১৬শ শতাব্দীর ধর্ম্মপ্রচারে বহির্গত হইল, সেদিন বাঙলার ইতিহাসে এক অতি স্মরণীয় দিন।

জগাইমাধাই উদ্ধার

এইরূপ প্রচার করিতে করিতে জগাইমাধাই-উদ্ধার ব্যাপার আসিয়া পড়িল। জগাইমাধাই নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ। দস্যুবৃত্তি করিয়া খাইত। গোমাংস এবং গুরুপত্নী—কিছুতেই তাহাদের আপত্তি ছিল না। ব্রাহ্মণের এত বড় দুর্গতি যেদিন হইয়াছিল, সেদিনও কি শ্রীপাদ নিত্যানন্দের আবির্ভাবের কারণ ইতিহাসে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না ? নিমাই জগাইমাধাই সম্পর্কে বলিলেন—

জানোঁ জানোঁ সেই দুই বেটা।
খণ্ড খণ্ড করিমু আইলে মোর হেথা॥
—(চৈঃ ভাঃ—মধ্য, ১৩শ অঃ)

'কাটিমু', 'খণ্ড খণ্ড করিমু'—ইহা নিমাই-চরিত্রের বিশেষত্ব। সত্য না হইলে, মিথ্যা করিয়া বৃন্দাবনদাস ইহা প্রভুর মুখ দিয়া বলাইতে সাহসী হইতেন না। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ এই 'খণ্ড খণ্ড' করা সমর্থন করিলেন না। ইহা আবার নিত্যানন্দ-চরিত্রের বিশেষত্ব।—

নিত্যানন্দ বলে খণ্ড খণ্ড কর তুমি।
সে দুই থাকিতে কোথা না যাইব আমি॥
কিসের বা এত তুমি করহ বড়াঞি।
আগে সেই দুইজনে গোবিন্দ বলাই॥

—(চৈঃ ভাঃ—মধ্য, ২৩শ অঃ)

অদ্বৈত হরিদাসকে সাহস দিয়া বলিলেন—কোন চিন্তা নাই; নিত্যানন্দ মাতাল, জগাইমাধাইও মাতাল। তিন মাতাল একসঙ্গে হইবে। এই দেখ, নিত্যানন্দ তাহাদের দলে আনিল বলিয়া। অদ্বৈত নিত্যানন্দকে সর্ব্বদাই 'মাতালিয়া' বলিতেন। রহস্যও আছে, আবার কিছুটা সত্যও থাকিতে পারে। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ, বলরামের অবতার। বলরাম মদ্যপায়ী, সর্ব্বজনবিদিত। একদিন এই প্রচারব্যপদেশে মাধাই 'কুপিয়া নিত্যানন্দ শিরে মুটকী (কলসীর কান্দা) মারিল'—

"ফুটিল মুটকী শিরে রক্ত পড়ে ধারে।"

এদিকে—

"আথেব্যথে লোক গিয়া প্রভুরে কহিল।"

তৎক্ষণাৎ সাঙ্গপাঙ্গসহ নিমাই ছুটিয়া আসিলেন।—

নিত্যানন্দের অঙ্গে সব রক্ত পড়ে ধারে।
হাসে নিত্যানন্দ সেই দুয়ের ভিতরে॥
রক্ত দেখি ক্রোধে প্রভু বাহ্য নাহি জানে।
চক্র, চক্র, চক্র, প্রভু ডাকে ঘনে ঘনে॥
আথেব্যথে চক্র আসি উপসন্ন হইল।
জগাইমাধাই তাহা নয়নে দেখিল॥

আথেব্যথে নিত্যানন্দ করে নিবেদন
মাধাই মারিতে প্রভু রাখিল জগাই।
দৈবে সে পড়িল রক্ত দুঃখ নাহি পাই॥
মোরে ভিক্ষা দেহ প্রভু এ দুই শরীর।
কিছু দুঃখ নাহি মোর তুমি হও স্থির॥

—(চৈঃ ভাঃ—মধ্য, ১৩শ অঃ)

নিমাই 'চক্র চক্র চক্র' বলিয়া ঘন ঘন ডাকিলেন। শুধু ডাকা নয়, চক্র স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইল। জগাইমাধাই তাহা চক্ষে পর্য্যন্ত দেখিল। কিন্তু নিত্যানন্দপ্রভু নিমাইকে বলিলেন: তুমি স্থির হও—"কিছু দুঃখ নাহি মোর, তুমি হও স্থির।"

প্রভু জগাইয়ের বক্ষে শ্রীচরণ তুলিয়া দিলেন। 'মাধাইয়ের চিত্ত ততক্ষণে ভাল হইল।' প্রভু তাদের আর পাপ করিতে নিষেধ করিলেন। "প্রভু বলে তোরা আর না করিস পাপ। জগাইমাধাই বলে—আর নারে বাপ।"

এই যে 'আর নারে বাপ'—ইহাকেই বলে রূপান্তর। ইহা প্রথমে হয় জীবনে—তারপরে হয় কাব্যে, ইতিহাসে। এখানেও তাই হইয়াছে।

জগাইমাধাই আর পাপ করে না। সূর্য্য না-উঠিতেই দুইজনে গঙ্গাস্নান করিয়া প্রতিদিন নির্জ্জনে বসিয়া দুইলক্ষ কৃষ্ণনাম জপ করে।

জগাইমাধাই উদ্ধার ব্যাপারে সর্ব্বপ্রথম নিত্যানন্দপ্রভুর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিল—দেদীপ্যমান হইয়া দেখা দিল। মহাপ্রভু ক্ষমা করিতে চান নাই, শাস্তি দিতেই চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা হইতে পারিল না। নিত্যানন্দ মস্তকে রক্তবিগলিত ধারা লইয়া বলিলেন—আমার রক্তপাত কিছু নয়, 'তোমরা হরি বোল'।

ইহার পূর্ব্বে প্রহরীদ্বারা হরিদাস বাইশবাজারে চাবুক খাইবার সময়েও—'তখনেহ তা সভারে মনে ভাল' দেখিয়াছিলেন।

নিত্যানন্দও সেই খেলাই দেখাইলেন। বৈষ্ণবধর্ম্মের এই দুই প্রথম প্রচারক, প্রচারের পদ্ধতি নিরূপণ করিয়া দিলেন। এই ক্ষমামূলক প্রচারপদ্ধতি, নিজ স্বভাব-বিরুদ্ধ হইলেও মহাপ্রভু স্বীকার করিলেন। ইহাই নেতৃত্ব।

জগাইমাধাই উদ্ধারে নিত্যানন্দের স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হইল। এই একটা ঘটনার প্রচার সকলকেই বিস্ময়ে স্তব্ধ করিয়া দিল। না দিবার কথা কী! ব্রাহ্মণ বা মুসলমান সম্প্রদায় ইহা দেখা তো দূরের কথা, স্বপ্নেও ভাবেন নাই।

জগাইমাধাই উদ্ধারে নিত্যানন্দের স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হইল

প্রচারের সাফল্য ভাবিয়া পাষণ্ডীগণ, সম্ভবতঃ গোড়া শাক্তগণ, কাজীর নিকট এই নূতন ধর্ম্ম প্রচার বন্ধ করিবার জন্য দরবার করিল। স্বজাতিদ্রোহী বাঙ্গালী সর্ব্বযুগেই আছে।

চাঁদ কাজী নবদ্বীপে থাকিতেন। তিনি গৌড়ের অধিপতি হুসেন শাহের দৌহিত্র। গোড়াই নামে তার এক কর্ম্মচারী এই অত্যাচারে অগ্রবর্ত্তী হইল। সংকীর্ত্তনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী হইল। মহাপ্রভু শুনিবামাত্রই আইন অমান্য করিলেন। 'চোদ্দমাদলে' চাঁদ কাজীর বাড়ীতে সংকীর্ত্তন নিয়া গেলেন। কাজীর সঙ্গে বোঝাপড়া হইল। রাজার সম্মতিসূচক খুন্তি—যা এখনও সংকীর্ত্তনের পুরোভাগে দেখা যায়—মহাপ্রভু লইয়া আসিলেন। রাজদ্বারে সংকীর্ত্তন জয়যুক্ত হইল। এই ব্যাপারে মহাপ্রভুর নেতৃত্বের ক্ষমতা প্রকাশ পাইল—প্রচারও খুব হইল।

চাঁদ কাজীর বাড়ী লুণ্ঠন

তারপর মহাপ্রভুর সন্ন্যাস। তিনি তাঁর সন্ন্যাস-সংকল্প প্রথম নিত্যানন্দকেই বলিলেন। নিত্যানন্দ কী সুন্দর উত্তর দিলেন : বলিলেন—তুমি জগৎ উদ্ধার করিবে। যে উপায় অবলম্বন করিলে ভাল মনে কর, তাই কর। বিধি বা নিষেধ তোমাকে কে দিবে?—

শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস

তথাপিহ কহ সর্ব্ব সেবকের স্থানে।
কেবা কি বলেন তাহা শুনহ আপনে॥
—(চৈঃ ভাঃ—মধ্য, ২৫ম অঃ)

ইহা সে যুগে কত বড় কথা! অবিসংবাদিত যে নেতা, তাঁহাকেও নিত্যানন্দ বলিলেন যে—শুধু আমাকে বলিলে কী হইবে, 'সর্ব্ব সেবকের' স্থানে কহ।

গণতন্ত্রযুগের অভিমানী, বিংশ শতাব্দীর বাঙলা নিত্যানন্দের নিকট যে কত বিষয়ে শিখিতে পারে—আত্মবিস্মৃত জাতি তা জানে না।—মহাপ্রভুকে একথা মানিতে হইল।—

এই মত নিত্যানন্দ সঙ্গে যুক্তি করি।
চলিলেন বৈষ্ণব সমাজে গৌরহরি॥
—(চৈঃ ভাঃ—মধ্য, ২৫ম অঃ)

গদাধর সন্ন্যাসে মত দিলেন না। বলিলেন—"গৃহস্থ তোমার মতে কি বৈষ্ণব নাই? তোমার যে মত বেদের সে মত নহে।" শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন—'ঈশ্বরে বৈরাগ্য কেন করে?' কিন্তু শ্রীপাদ নিত্যানন্দের কথাই শিরধার্য্য করিয়া মহাপ্রভু কাটোয়া গিয়া কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস নিলেন। মন্ত্র নিলেন না। কেশব ভারতীর কর্ণে মন্ত্র দিয়া, সেই মন্ত্রই আবার গ্রহণ করিলেন মাত্র।

১৫০৯ খৃষ্টাব্দে, ২৪ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস লইয়া মহাপ্রভু নীলাচলে চলিয়া গেলেন নিত্যানন্দ সঙ্গে গেলেন। দেড় মাস নীলাচলে থাকিয়া মহাপ্রভু ৭ই বৈশাখ (১৫১০ খৃঃ) দাক্ষিণাত্যে প্রচারে গেলেন। মনে হয়, মহাপ্রভু নিজে প্রথম প্রচারের আদর্শ ও পদ্ধতি দেখাইবেন—এইরূপ অভিপ্রায়।

গোবিন্দের করচায় দেখা যায়—মহাপ্রভু রামেশ্বর পর্য্যন্ত প্রচার করিলেন। আবার—নাসিক, আমেদাবাদ, দ্বারকা, প্রভাস, ইত্যাদিও গেলেন। এই প্রচারে—

(ক) বিভিন্ন দার্শনিক মতাবলম্বী পণ্ডিতদের সহিত প্রভু তর্ক ও

বিচার করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের শক্তিবাদ ও পরকীয়াবাদ প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং বিশেষভাবে শাঙ্কর অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ আর বৌদ্ধ অনাত্মবাদ ও শূন্যবাদ খণ্ডন করিলেন।

(খ) রাজা ও দরিদ্রে, সমানভাবে নাম প্রচার করিলেন।

(গ) ভগবতী, শিব প্রভৃতি দেবদেবীর মন্দিরে গিয়া পূজা করিলেন। তবে বলি নিষেধ করিলেন।

(ঘ) বিশেষভাবে বেশ্যাদিগকে ও দস্যুদিগকে নাম দিয়া উদ্ধার করিলেন। সমাজ যাহাদের উদ্ধারের কোন আশাই নাই বলিয়া দিয়াছে, মহাপ্রভুর প্রচার বলিল যে—না, তাহাদেরও উদ্ধার আছে। বাঙালীর বৈষ্ণবধর্ম্মের ইহাই বিশেষত্ব।

মহাপ্রভুর এই দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের কাল ১৫১০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহ হইতে ১৫১২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত। ১ বৎসর ৮ মাস ২৬ দিন। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পর মহাপ্রভু নীলাচলে ফিরিয়া ২ বৎসর অবস্থান করিলেন। এই ২ বৎসর—১৫১২ এবং ১৫১৩ খৃষ্টাব্দ।

জননী ও জাহ্নবী দেখিবার জন্য বঙ্গদেশে আসিবার ইচ্ছা। কিন্তু রামানন্দ আসিতে দেয় না—"রামানন্দ হটে প্রভু না পারে চলিতে"।

১৫১৪, সেপ্টেম্বর কিংবা অক্টোবরে তিনি গৌড় অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রামকেলী গ্রামে কানাইয়ের নাটশালায় আসিয়া পৌঁছিলেন।

রামকেলী—মালদহ জেলায় গৌড়ের নিকট গ্রাম। গৌড় রাজধানী, হুসেন শাহ তখন গৌড়ের রাজা। ষ্টুয়ার্টের মতে, হুসেন শাহর রাজত্বকাল ১৪৯৯—১৫২০: কিন্তু ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ বলেন—হুসেন শাহর রাজত্বকাল ১৪৯৩ হইতে ১৫১৮ খৃষ্টাব্দ। ২৬ বৎসর হুসেন শাহর রাজত্বকাল। মহাপ্রভুর আগমনকালে—উভয় ঐতিহাসিকের মতেই—হুসেন শাহ গৌড়ের অধিপতি।

হুসেন শাহ সম্পর্কে বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

যে হুসেন শাহ সর্ব্ব উড়িয়ার দেশে।
দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষে॥
উড্রদেশে কোটি কোটি প্রতিমা প্রাসাদ।
ভাঙ্গিলেক কত কত করিল প্রমাদ॥

—(চৈঃ ভাঃ—অন্ত্য, ৪র্থ অঃ)

এই রাজনৈতিক পটভূমিকার উপর মহাপ্রভু অতিশয় দুঃসাহসিকতার সহিত রামকেলী আসিয়া হুসেন শাহর দুই মন্ত্রী, সাকর মল্লিক ও দবীর খাস (রূপ আর সনাতন)—ইঁহাদের সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিলেন। রাজমন্ত্রী সনাতন, প্রভুকে নীলাচলে অনেকবার গোপনে পত্র দিয়াছেন দেখা করিবার জন্য—"দৈন্য পত্রি লিখি মোরে পাঠালে বার বার"। এই দৈন্য পত্রি লেখা ১৫১২ কিংবা ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে হইতে পারে।

মহাপ্রভুর রামকেলী কানাইয়ের নাটশালায় আগমন—রূপ সনাতনের সহিত গোপনে মিলন

১৫১৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর কিংবা অক্টোবরে (বিজয়া দশমীর দিন) প্রভু নীলাচল হইতে গৌড় অভিমুখে রওনা হইলেন। সাকর মল্লিক ও দবীর খাস, স্বাধীন গৌড়ের এই দুই প্রধান মন্ত্রী দুপুর রাত্রে বেশ লুকাইয়া প্রভুকে দেখিতে আসিলেন।—

অর্দ্ধরাত্রে দুই ভাই এলা প্রভু স্থানে।
প্রথমে মিলিল নিত্যানন্দ হরিদাস সনে॥

—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ১ম পঃ)

সুতরাং শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে এক্ষেত্রেও আমরা মহাপ্রভুর সঙ্গে দেখিতে পাইতেছি। শ্রীপাদ নিত্যানন্দের সহিত পরামর্শ না-করিয়া প্রভু এই দুঃসাহসিক কার্য্যে ব্রতী হন নাই। সাকর মল্লিক ও দবীর খাস মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর দলে যোগ দিবেন, স্বীকার করিলেন। মহাপ্রভুর অদ্ভুত সংগঠন-শক্তির পরিচয় আমরা পাইলাম।

মহাপ্রভুর দল গড়িবার ইচ্ছা বা যোগ্যতা ছিল না—যাঁহারা বলেন বা লিখিয়াছেন, তাঁহারা বাচালতা করিয়াছেন মাত্র; চরিতগ্রন্থগুলি ভাল করিয়া পাঠ করেন নাই।* প্রভুকে মন্ত্রী দবীর খাস বলিলেন: হুসেন শাহ যবন জাতি, তাহাকে বিশ্বাস করিও না—"তথাপি যবন জাতি না করিহ প্রতীতি"; তুমি এখান হইতে শীঘ্র চলিয়া যাও। কেশব ছত্রীও (একজন অমাত্য) বলিয়া পাঠাইলেন—"রাজার নিকট গ্রামে কি কার্য্য থাকিয়া?"

দবীর খাস ও কেশব ছত্রীর কথা অনুযায়ী ১৫১৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস মধ্যে প্রভু নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন। তারপর ১৫১৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর কিংবা অক্টোবর মাসে মহাপ্রভু নীলাচল হইতে বৃন্দাবন যাত্রা করেন। এবং ১৫১৬ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে নীলাচলে ফিরিয়া আসেন। তখন নিত্যানন্দপ্রভুকে আমরা নীলাচলেই দেখিতে পাই। ১৫১৬ খৃষ্টাব্দেই মহাপ্রভু শ্রীপাদ নিত্যানন্দপ্রভুকে সত্বর নবদ্বীপে গিয়া প্রচার আরম্ভ করিবার আদেশ দিলেন।—

শুন নিত্যানন্দ মহামতি।
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া আছি আমি নিজমুখে।
মূর্খ, নীচ, দরিদ্র ভাসাব প্রেমসুখে॥
তুমিও থাকিলা যদি মুনি ধর্ম্ম করি।
আপন উদ্দাম ভাব সব পরিহরি॥
তবে মূর্খ নীচ যত পতিত সংসার।
বল দেখি আর কেবা করিবে উদ্ধার॥
ভক্তিরসদাতা তুমি, তুমি সম্বরিলে।
তবে অবতার বা কি নিমিত্ত করিলে॥
এতেক আমার বাক্য যদি সত্য চাও।
তবে অবিলম্বে তুমি গৌড়দেশে যাও॥

মহাপ্রভু শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে গৌড় দেশে প্রচারের জন্য প্রেরণ করিলেন

* Vaishnava Faith & Movement in Bengal (77-78 Pages)—ডাঃ সুশীলকুমার দে।

মূর্খ নীচ পতিত দুঃখিত যত জন।
ভক্তি দিয়া কর গিয়া সভার মোচন॥
—(চৈঃ ভাঃ—অন্ত্য, ৫ম অঃ)

তারপর—

আজ্ঞা পাই নিত্যানন্দ চন্দ্র সেইক্ষণে।
চলিলেন গৌড়দেশে লই নিজগণে॥
রামদাস গদাধর দাস মহাশয়।
রঘুনাথ বেজ ওঝা ভক্তি রসময়॥
কৃষ্ণদাস পণ্ডিত পরমেশ্বর দাস।
পুরন্দর পণ্ডিতের পরম উল্লাস॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের যত আপ্তগণ।
নিত্যানন্দ সঙ্গে সভে করিলা গমন॥
—(চৈঃ ভাঃ—অন্ত্য, ৫ম অঃ)

এই প্রসঙ্গে জয়ানন্দ লিখিয়াছেন—

তিন মাস বৈ নিত্যানন্দ গৌড় গেলা।
ঘরে ঘরে সংকীর্ত্তন পাতিলেক খেলা॥
নিত্যানন্দ কহিলেন ভাস্কর দাসে।
ঘরে ঘরে শ্রীমূর্ত্তি দেহ গৌড় দেশে॥
—(চৈঃ মঃ—উত্তর খণ্ড)

শ্রীপাদ নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করিবার আদেশ দেন

প্রচারের সাফল্যের জন্য নিত্যানন্দপ্রভুই প্রথমে রাঢ়ে ও গৌড়ে মহাপ্রভুর মূর্ত্তি গড়িয়া ঘরে ঘরে পূজা করিবার আদেশ দেন ও ব্যবস্থা করেন। ইহা মহাপ্রভুর জীবিতকালেই নিত্যানন্দপ্রভু করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব সাধারণের মধ্যে আজও যে শ্রীগৌরাঙ্গের মূর্ত্তি পূজার প্রচলন আছে, প্রচারব্যপদেশে এই প্রথার প্রবর্ত্তক শ্রীপাদ নিত্যানন্দপ্রভু। খেতুরীর মহোৎসব, ইহার অনেক পরের ঘটনা।

ইহার একশত বৎসর পরে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের যে সিদ্ধান্ত বাঙলায় আসিবে—তাহাতে শ্রীগৌরাঙ্গের মূর্ত্তি পূজা নয়, শ্রীরাধা-কৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি পূজা করার কথাই থাকিবে। ইতিহাসপথে বাঙালীর বৈষ্ণবধর্ম্ম বৃন্দাবনের গোস্বামীদের সিদ্ধান্তের দিকেই বেশী আকৃষ্ট হইবে।

শ্রীপাদ নিত্যানন্দপ্রভু পাণিহাটীকে কেন্দ্র করিয়াই প্রথম প্রচার আরম্ভ করিলেন। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল হইতেই আমরা ইহার বিস্তৃত বিবরণ পাই।—

আগে পাণিহাটী আর আকনা মহেশ।
পূণ্যভূমি সপ্তগ্রাম ধন্য রাঢ় দেশ॥
আগরপাড়া কুমারহট্ট চৌহাটা।
খড়দা কোটাল তাম্বুলি পাথরঘাটা॥
হাথিয়াগড় ছত্রভোগ বরাহনগর।
কোঠরঙ্গ বাণীদিঘী চাতরা মনোহর॥
হাথিয়াকান্দা পাঁচপাড়া বেতর বূঢ়ল।
অম্বুয়া বড়গাদি কাঁচপাড়া সুপত্তন॥
কাশী আই পঞ্চ আদ্দারি আদহ কলিআ।
থানা চৌড়া ফুলিয়া দোগাছিআ॥
নিমদা চৌয়ারিগাছা উদ্ধ্রনপুর নৈহাটী।
বসই বেনড়াখণ্ড হাটাই চরখি॥

—(চৈঃ মঃ—বিজয় খণ্ড)

কিরূপ বেশে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রচার আরম্ভ করিলেন? যোদ্ধবেশ, যেন যুদ্ধে চলিয়াছেন। সোনা, মণিমাণিক্যের, অলঙ্কারাদি পরিধান করিয়াছেন। সন্ন্যাসীর আচার-ব্যবহারই শুধু নয়, সন্ন্যাসীর বেশও পরিত্যাগ করিয়াছেন। জয়ানন্দ লিখিয়াছেন—

মহামল্ল বেশ ধরে অবধূত রায়ে।
রুনুঝুনু কনক নূপুর বাজে পায়ে॥

সুবর্ণ বৈদূর্য্য বিক্রম মুক্তাদাম।
ত্রৈলোক্য সুন্দর রূপ দেখি অনুপাম॥

হেমজড়িত গজমুক্তা শ্রুতিমূলে।
কত রক্তোৎপল রাঙা চরণ কমলে॥

লটপটি পাতাড়ি পিন্ধন পাটবাস।
আখণ্ড পূর্ণচন্দ্র বদন প্রকাশ॥

আরক্ত লোচন ভ্রূহি মদন কামান।
কটাক্ষে সন্ধানে সব বিধির নির্ম্মান॥

মৃদু মধুর সুধা বচন গম্ভীর।
গজেন্দ্র গমনমত্ত চলন অস্থির॥

সুচারু দশন মণি মাণিক্যের ছটা।
চরণে আসিয়া পড়ে মুক্তা গোটা গোটা॥

নানা ফুলে বিরচিত গলে দিব্য মালা।
ধরনী আন্দোলে যেন রহি রহি লোলে॥

গ্রামে গ্রামে নগরে সেবক প্রতি ঘরে।
চৈতন্য আনন্দে নিত্যানন্দ নৃত্য করে॥

—(চৈঃ মঃ—বিজয় খণ্ড)

নিত্যানন্দপ্রভু যার যার ঘরে নৃত্য করিয়াছিলেন, তাদের নাম পর্য্যন্ত আছে। যথা—রামদাস, মুরারি, চৈতন্য দাস, সুন্দরানন্দ, পরমেশ্বর দাস, কালিয়া, কৃষ্ণদাস, কমলা কর পিপ্‌লাই, গৌরীদাস পণ্ডিত, ধনঞ্জয় পণ্ডিত, পুরন্দর পণ্ডিত, কৃষ্ণদাস, পুরুষোত্তম দাস, শ্রীআচার্য্যচন্দ্র, মাধবানন্দ; এবং—বাসুদেব ঘোষ, রঘুনন্দন, নরহরি দাস, বংশীবদন, পরমানন্দ গুপ্ত, রঘুনাথ পুরী, পরমানন্দ উপাধ্যায়, নন্দন আচার্য্য, উদ্ধারণ দত্ত, চিরঞ্জীবী কৃষ্ণদাস, দেবানন্দ, মহানন্দ, নারায়ণ, গঙ্গাদাস পণ্ডিত, জগদীশ, হিরণ্য, পুরুষোত্তম দত্ত, শ্রীজীব, মকরধ্বজ...ইত্যাদি।

ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, সুবর্ণবণিক, প্রভৃতি সকল জাতিতে মিলিয়া

শ্রীচৈতন্যদেবের নামাঙ্কিত বৈষ্ণবধর্ম্মের আবরণে, শ্রীপাদ নিত্যানন্দের অধীনে একটা বিরাট বৈষ্ণব-সমাজ গঠিত হইতে চলিল। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ইহা শ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রচারের ফল। এই বৈষ্ণব-সমাজে সেদিন জাতিভেদ ছিল না। বৃন্দাবনদাস স্পষ্টই লিখিয়াছেন—

বৈষ্ণব-সমাজে জাতিভেদ নাই

"বৈষ্ণবের জাতি বুদ্ধি যে করে।
কোটি কোটি জন্ম অধম যোনিতে ডুবি সে মরে॥"

অদ্যাপি সংকীর্ত্তনে গাওয়া হয়—"ব্রাহ্মণে চণ্ডালে করে কোলাকুলি; কবে বা ছিল এ রঙ্গ।"

শ্রীবাসের বাড়ীতে অভিষেকের সময় আচার্য্য অদ্বৈত মহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন—

"চণ্ডাল নাচুক তোর নামগুণ গ্যায়া।"

মহাপ্রভু উত্তর দিয়াছিলেন—

"সত্য যে তোমার অঙ্গীকার।"

শ্রীপাদ নিত্যানন্দ, মহাপ্রভুর এই অঙ্গীকার অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া গিয়াছেন। কথিত আছে, ষাট হাজার বৌদ্ধ ন্যাড়া-নেড়ীকে দীক্ষা দিয়া একদিনে তিনি তাহাদিগকে বৈষ্ণব-সমাজের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীপাট-খড়দহে এই শুদ্ধি-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। ভগিনী নিবেদিতা ইহা সগৌরবে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রচারের কেন্দ্র নবদ্বীপে হইল না—হইল শ্রীপাট-পাণিহাটী ও শ্রীপাট-খড়দহে। এই যবন-চণ্ডাল-ব্রাহ্মণ এবং বাঙলার সমস্ত জাতিকে একত্র করিয়া যে সামাজিক-সাম্যবাদ প্রচার শ্রীপাদ নিত্যানন্দ করিয়াছিলেন—ব্রাহ্মণপ্রধান নবদ্বীপে থাকিয়া তাহা চলিত না।

নিত্যানন্দ ষাট হাজার বৌদ্ধ ন্যাড়ানেড়ীকে দীক্ষা দিয়া বৈষ্ণব-সমাজের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন

পাণিহাটীতে রাঘব পণ্ডিতের ভবনে শ্রীপাদ নিত্যানন্দের অভিষেক হইল—যেমন নবদ্বীপে শ্রীবাসের বাড়ীতে মহাপ্রভুর অভিষেক হইয়াছিল। অভিষেকের সময় নিত্যানন্দপ্রভু সোনার খট্টায় বসিয়াছিলেন। কুণ্ডল, মণিমাণিক্য, অলঙ্কারাদিও কিছু ধারণ করিয়াছিলেন। গৃহী মহাপ্রভুর অভিষেক অপেক্ষা অবধূত সন্ন্যাসী নিত্যানন্দের অভিষেকে রাজসিকতা অনেক বেশী ছিল। এই অভিষেক আর কিছুই নয়, সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রচারের নেতৃত্ব গ্রহণ। নিত্যানন্দপ্রভু এই নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। ইহা অনেকটা ডিক্‌টেটার (Dictator) হওয়ার মত। মহাপ্রভু নিজমুখে নিত্যানন্দ প্রভুকে বলিয়াছেন—"শ্রীপাদ তোমার গৌড়রাজ্যে কারো নাহি অধিকার।"

পাণিহাটীতে রাঘব পণ্ডিতের ভবনে শ্রীপাদ নিত্যানন্দের অভিষেক

শ্রীপাদ নিত্যানন্দ তুমুল সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, মহোৎসব করিতে লাগিলেন। ছত্রিশ জাতি একপংক্তিতে বসিয়া ভোজন করিতে লাগিল। পাণিহাটীতে নিত্যানন্দপ্রভু রঘুনাথ দাসকে দিয়া চিড়া-মহোৎসব আরম্ভ করিলেন।—

নিত্যানন্দ কর্ত্তৃক সংকীর্ত্তন ও মহোৎসব

চিড়া দধি মহোৎসব খ্যাত নাম যার।

* * *

এক ঠাঞি তপ্ত দুগ্ধে চিড়া ভিজাইয়া।
অর্দ্ধেক ছানিল দধি চিনি কলা দিয়া॥
অর্দ্ধেক ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধেতে ছানিল।
চাঁপাকলা চিনি ঘৃত কর্পূর তাতে দিল॥

* * *

উদ্ধারন দত্ত আদি যত আর নিজজন।
উপরে বসিল সব কে করে গণন॥
শুনি পণ্ডিত ভট্টাচার্য্য যত বিপ্র এলা।
মান্য করি প্রভু সবারে উপরে বসাইলা॥

—(চৈঃ চঃ—অন্ত্য, ৬ষ্ঠ পঃ)

এই ইতিহাসে-স্মরণীয় চিড়া-মহোৎসবে নিত্যানন্দপ্রভু এক অলৌকিক কার্য্য করিলেন। তিনি ধ্যানে মহাপ্রভুকে নীলাচল হইতে সশরীরে এই চিড়া-মহোৎসবে আনয়ন করিলেন।—

ধ্যানে তবে প্রভু মহাপ্রভুরে আনিল॥
মহাপ্রভু এলা দেখি নিতাই উঠিলা।
তারে লঞা সবা চিড়া দেখিতে লাগিলা॥
সকল কুণ্ডি হোলনার চিড়া একেক গ্রাস।
মহাপ্রভু মুখে দেন করি পরিহাস॥

—(চৈঃ চঃ—অন্ত্য, ৬ষ্ঠ পঃ)

মহাপ্রভু যে সশরীরে চিড়া-মহোৎসবে আসিয়াছিলেন, তাহা সকলে দেখিতে পান নাই।—

"মহাপ্রভু দর্শন পায় কোন ভাগ্যবানে।"

নিত্যানন্দপ্রভুর প্রবর্ত্তিত এই চিড়া-মহোৎসব পংক্তি-ভোজনে, হিন্দু-সমাজের জাতিভেদ-প্রথা লোপ পাইতে বসিল এবং ইহার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াও দেখা দিয়াছিল। কবিরাজ গোস্বামীর মতে—মহাপ্রভুর নীলাচল হইতে চিড়া-মহোৎসবে পাণিহাটীতে আসা, কিছুই অসম্ভব নয়; কেননা, তর্ক না-করিয়া তিনি অলৌকিকে বিশ্বাস করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু এ-সম্পর্কে জয়ানন্দ কিছু গোল বাধাইয়াছেন।

জয়ানন্দের শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দপ্রভুকে স্পষ্টই বলিয়াছেন—

মহোৎসব মাগিয়া নাচেন সংকীর্ত্তনে।
হেন যুক্তি তোমারে দিলেক কোন জনে॥

—(জয়া, চৈঃ মঃ—উত্তর খণ্ড)

জয়ানন্দের কথায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, মহোৎসব করিবার যুক্তি নিত্যানন্দপ্রভুকে তিনি দেন নাই। সত্যই মহাপ্রভু যদি চিড়া-মহোৎসবে সশরীরে আসিয়া থাকেন, কিম্বা ভাব-শরীর লইয়াও

আসিয়া থাকেন—তবে জয়ানন্দের কথার কী অর্থ হয়? অথচ জয়ানন্দের কথার উত্তরে শ্রীপাদ নিত্যানন্দপ্রভু, মহাপ্রভুকে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন—"কাঠিন্য কীর্ত্তন কলিযুগ ধর্ম্ম নহে।" মহোৎসবে জাতিভেদভঙ্গকারী পংক্তি-ভোজন, শ্রীপাদ নিত্যানন্দপ্রভুই প্রবর্ত্তন করেন।

প্রচারের সাফল্যের জন্য জাতিভেদবিরোধী মহোৎসবের প্রয়োজন আছে। প্রয়োজনবোধেই নিত্যানন্দপ্রভু মহোৎসব প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। বিনা প্রয়োজনে করেন নাই। মহাপ্রভু হইতে শ্রীপাদ নিত্যানন্দপ্রভু, এক্ষেত্রে অধিকতর উদার।

শ্রীপাদ নিত্যানন্দপ্রভুর আচরণের বিরুদ্ধে কটাক্ষ করিয়া নীলাচলে লোকেরা মহাপ্রভুর নিকট লাগানি করিয়াছিল। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

শ্রীপাদ নিত্যানন্দের চরিত্রের প্রতি কটাক্ষ করিয়া নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট অভিযোগ

সেই নবদ্বীপে এক আছেন ব্রাহ্মণ।
চৈতন্যের সঙ্গে তান পূর্ব্ব অধ্যয়ন॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের দেখিয়া বিলাস।
চিত্তে কিছু তান জন্মিয়াছে অবিশ্বাস॥
চৈতন্যচন্দ্রেতে তান বড় দৃঢ় ভক্তি।
নিত্যানন্দ স্বরূপের না জানে শক্তি॥

—(চৈঃ ভাঃ—অন্ত্য, ৭ম অঃ)

নীলাচলে এই সন্দিগ্ধ ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিতে গেল—

বিপ্র কহে প্রভু মোর এক নিবেদন।
করিমু তোমার স্থানে যদি দেহ মন॥
নবদ্বীপ গিয়া নিত্যানন্দ অবধূত।
কিছুই না বুঝোঁ করেন কিরূপ॥
সন্ন্যাস আশ্রম তান বলে সর্ব্বজন।
কর্পূর তাম্বুল যে ভক্ষণ অনুক্ষণ॥
ধাতুদ্রব্য পরশিতে নাহি সন্ন্যাসীরে।
সোনা রূপা সে সকল কলেবরে॥

কাষায় কৌপিন ছাড়ি দিব পট্টবাস।
ধরেন চন্দন মালা সদাই বিলাস॥
দণ্ড ছাড়ি লৌহদণ্ড ধরেন বা কেনে।
শূদ্রের আশ্রমে যে থাকেন সর্ব্বক্ষণে॥
শাস্ত্রমত মুঞি তার না দেখোঁ আচার।
এতেকে মোহের চিত্তে সন্দেহ অপার॥
বড়লোক বলি তাঁরে বোলে সর্ব্বজনে।
তথাপি আশ্রমাচার না করেন কেনে॥

—(চৈঃ ভাঃ—অন্ত্য, ৭ম অঃ)

ব্রাহ্মণের সন্দেহের কথা শুনিয়া মহাপ্রভু হাসিয়া উত্তর দিলেন—

মহাপ্রভুর উত্তর

শুন বিপ্র—যদি মহা অধিকারী হয়।
তবে তান গুণ দোষ কিছু না জন্ময়॥
পদ্মপাত্রে কভু যেন না লাগয়ে জল।
এইমত নিত্যানন্দ স্বরূপ নির্ম্মল॥
পরমার্থে কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহান শরীরে।
নিশ্চয় জানিহ বিপ্র সর্ব্বদা বিহরে॥

—(চৈঃ ভাঃ—অন্ত্য, ৭ম অঃ)

তারপর অনধিকারীর জন্য মহাপ্রভু একটা সাবধান-বাণী বলিলেন—

অধিকারী বই করে তাঁহান আচার।
দুঃখ পায় সেই জন পাপ জন্মে তার॥
রুদ্র বিনে অন্যে যদি করে বিষ পান।
সর্ব্বথায় মরে সর্ব্ব পুরাণ প্রমাণ॥

—(চৈঃ ভাঃ—অন্ত্য, ৭ম অঃ)

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থেও ইহার আভাস আছে।—

নীলাচলে বিপ্র আর গৌরাঙ্গ রহিলা।
নিত্যানন্দে গৌড় রাজ্য প্রভু সমর্পিলা॥

কতোদিনে নিত্যানন্দ রথযাত্রা কালে।
সর্ব্ব পারিষদ সঙ্গে গেলা নীলাচলে॥
গৌরচন্দ্র জিজ্ঞাসিল শ্রীপাদ গোঁসাই।
তোমার গৌড়রাজ্যে কারো অধিকার নাই॥
কর্ত্তাল মৃদঙ্গ যন্ত্র মাল্য চন্দনে।
শিঙ্গা বেত্র গুঞ্জাহার নূপুর আভরণে॥
মহোৎসব মাগিয়া নাচেন সংকীর্ত্তনে।
হেন যুক্তি তোমারে দিলেক কোন জনে॥

—(চৈঃ মঃ—উত্তর খণ্ড)

স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, মহাপ্রভু হেন যুক্তি দেন নাই। বরং কথার ভাবে বুঝা যায় যে, ইহা তাঁহার তেমন অভিপ্রেত নয়। শুনিয়া নিত্যানন্দ বিচলিত হইলেন না, একটু হাসিলেন মাত্র। স্থান-কাল-পাত্র উপযোগী যে সহজ প্রচার-পদ্ধতি তিনি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাই যুগ-প্রয়োজন বলিয়া তিনি মহাপ্রভুকে বুঝাইয়া নিজ মত বহাল রাখিলেন।—

শুনি নিত্যানন্দ গোঁসাই হাসি হাসি কহে।
কাঠিন্য কীর্ত্তন কলিযুগ ধর্ম্ম নহে॥

—(চৈঃ মঃ—উত্তর খণ্ড)

আমরা দেখিতেছি, শ্রীপাদ নিত্যানন্দপ্রভুর গৌড়দেশে প্রচার সম্বন্ধে মহাপ্রভুর সঙ্গে তাঁহার কথোপকথন হইয়াছিল। এবং এই কথোপকথন মধ্যে কিছুটা বাদানুবাদও হইয়াছিল। পরে শ্রীপাদ নিত্যানন্দপ্রভু, "কাঠিন্য কীর্ত্তন কলিযুগ ধর্ম্ম নহে"—এই কথা বলিয়া প্রভুকে প্রবোধ দিয়া নিজ মত ও নিজের প্রচার-পদ্ধতি বহাল রাখিলেন। মহাপ্রভু আর কোন আপত্তি করিলেন না।—

"অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়।
অভিমান শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়॥"

তারপর "পতিতেরে নিরখিয়া দুই বাহু পশারিয়া ; আইস আইস বলি দেয় ক্রোড়"—ইহাই নিত্যানন্দ-চরিত্রের বিশেষত্ব।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে, মহাপ্রভুর জীবিতকালেই, ভাগবতে যাহাকে বলে 'অকিঞ্চন সমরস'—নিত্যানন্দপ্রভু গৌড় ও রাঢ়ে তাহাই আচণ্ডালে প্রচার করিয়াছেন। ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল নিত্যানন্দপ্রভুর গুণাবলীর কথা উল্লেখ করিয়া আমাকে বলিয়াছেন যে : 'ডিমোক্র্যাসী' (Democracy) যদি একটা রস হয়, তবে তারই নাম 'অকিঞ্চন সমরস', এবং শ্রীপাদ নিত্যানন্দপ্রভুই বাঙলার ইতিহাসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডিমোক্র্যাট (Democrat)। মহাপ্রভু দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া সপ্তদশ শতাব্দীতে বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ (শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব) প্রচার করিয়াছেন—'যুগলরস'। আর ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রচার করিয়াছেন 'অকিঞ্চন সমরস', পতিত-উদ্ধার। এই দুইটি ধারা পর পর বাঙালাদেশে আসিয়া মিলিত হইয়া মহাপ্রভুর নামাঙ্কিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম নামে প্রচারিত হইয়াছে। শুধু 'যুগলরস' বৈষ্ণবধর্ম্ম নয়, ইহার সহিত 'অকিঞ্চন সমরস' (পতিত-উদ্ধার) থাকিতে হইবে। নতুবা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম অসম্পূর্ণ।

অকিঞ্চন সমরস

যুগলরস ও অকিঞ্চন সমরসের সমন্বয়

নিত্যানন্দপ্রভু গঙ্গার উভয় তীরে গ্রামে গ্রামে যাইতে লাগিলেন। অস্পৃশ্য ক্ষুব্ধ জনতা নিত্যানন্দপ্রভুর চরণতলে পড়িয়া বুঝি বা সেদিন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এমন তো তারা কেহকে কোনদিন পায় নাই। নিত্যানন্দের চরণস্পর্শে পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গের মত সমাজের কত বড় এই অস্পৃশ্য অংশ সিংহগর্জ্জনে লাফাইয়া উঠিয়াছিল। এমন কি আর কখনও হইয়াছে? এমন কি আর কেহ পারিয়াছে? ষোড়শ হইতে বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে—এমন আর হয় নাই, এমন আর কেহ পারে নাই।

যদি এই ধর্ম্মপ্রচার না হইত, তবে আজ কয়জন বাঙালী হিন্দু থাকিত? নগণ্য সংখ্যালঘুতে পরিণত হইয়া, তাহারা আজ নিশ্চিহ্ন

হইয়া যাইত। শ্রীপাদ নিত্যানন্দের গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচারের ঐতিহাসিক গুরুত্ব এইখানে।

শ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রচার যখন দ্বাদশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে এবং মহাপ্রভুর দ্বাদশ বর্ষব্যাপি দিব্যোন্মাদ যখন ছয় বৎসর অতিক্রম করিয়াছে (সম্ভবতঃ ১৫২৮ খৃঃ), তখন শান্তিপুর হইতে আচার্য্য অদ্বৈত জগদানন্দকে দিয়া নীলাচলে মহাপ্রভুকে এক তরজা-প্রহেলী কহিয়া পাঠাইলেন।—

মহাপ্রভুকে আচার্য্য অদ্বৈতের তরজা প্রেরণ

প্রভুকে কহিয় আমার কোটি নমস্কার।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার ॥
বাউলকে কহিও লোকে হৈল আউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল ॥
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল ॥

—(চৈঃ চঃ—অন্ত্য, ১৯শ পঃ)

এই তরজা প্রহেলীতে আচার্য্য অদ্বৈত, শ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রচারের বিরুদ্ধে কটাক্ষ করিয়াছেন বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন।

এই তরজা নিত্যানন্দের প্রচারের বিরুদ্ধে কটাক্ষ কি-না

কিন্তু আমি তাহা করি না। কেননা, অভিষেকের সময় শ্রীঅদ্বৈত মহাপ্রভুকে দিয়া অঙ্গীকার করাইয়া লইয়াছিলেন—"চণ্ডাল নাচুক তোর নাম গুণ গ্যায়া।" নিত্যানন্দ-প্রভুর প্রচার তাহাই করিয়াছিল। সুতরাং ইহা কটাক্ষ হইতে পারে না। তরজার অর্থ যাহাই হউক, ইহা নিত্যানন্দের প্রচারের বিরুদ্ধে কটাক্ষ মনে করা যুক্তিসিদ্ধ নয়।

শ্রীপাদ নিত্যানন্দ যখন গৌড়ে প্রচার আরম্ভ করেন (১৫১৬ খৃঃ), তখন হুসেন শাহর রাজত্বকাল শেষ হইবার দুই কিংবা চারি বৎসর বাকী। হুসেন শাহর জ্যেষ্ঠ পুত্র নসরৎ শাহ ১৫১৮ কিংবা ১৫২০ খৃষ্টাব্দে গৌড়ে রাজা হন। এবং যে বৎসর পুরীতে প্রভুর তিরোভাব ঘটে (১৫৩৩ খৃঃ), সেই বৎসর নসরৎ শাহকে একজন

ভৃত্য গুপ্তহত্যা করে। হুসেন শাহর রাজত্বের শেষ দুই-চারি বৎসর, আর নসরৎ শাহর সম্পূর্ণ রাজত্বকাল —শ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রচার-কাল। রাজ-শক্তির সহিত সংঘর্ষ ব্যতিরেকে নির্ব্বিঘ্নে এই প্রচার সম্পন্ন হয় নাই। মহাপ্রভুর তিরোভাবের পরেও দ্বাদশ বৎসর (১৫৪৫ খৃঃ), শ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রচার চলিয়াছে। ইহা মহাপ্রভুর জীবিতকালের শেষ ১৮ বৎসর (১৫১৬ খৃঃ—১৫৩৩ খৃঃ) এবং তাঁহার তিরোভাবের পর ১২ বৎসর (১৫৩৩ খৃঃ—১৫৪৫ খৃঃ)। একাদিক্রমে এই ৩০ বৎসর গৌড়ে ও রাঢ়ে শ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রচার চলিয়াছে।

শ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রচারের কাল

১৬১৫ খৃষ্টাব্দে কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ শেষ করেন। তার পূর্ব্বে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের গ্রন্থ বাঙলাদেশে আসে নাই। সুতরাং ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধেও (১৫৫০ খৃঃ—১৬০০ খৃঃ) শ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রচারের জের চলিয়াছে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রচারের বিষয়বস্তু, ঠিক এক নয়। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রচার করিয়াছেন—শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীমূর্ত্তি। শ্রীগৌরাঙ্গই শ্রীকৃষ্ণ এবং তিনিই উপাস্য। সপ্তদশ শতাব্দীর বৃন্দাবনের গোস্বামীদের প্রচার মুখ্যতঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি। এই যুগলমূর্ত্তিই উপাস্য। শ্রীগৌরাঙ্গ উপায়, উপাস্য নহেন। শ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রচারের বিশেষত্ব পরিস্ফুট করিবার জন্যই ইহার উল্লেখ করিতে হইল।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রচার

মহাপ্রভুর তিরোভাবের অত্যল্প পরেই শ্রীপাদ নিত্যানন্দ বিবাহ করেন। চৈতন্যভাগবত অথবা চৈতন্য-চরিতামৃতে ইহার উল্লেখ নাই সত্য, কিন্তু এ প্রসঙ্গে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল এবং ভক্তি-রত্নাকর—অপ্রামাণিক গ্রন্থ নহে। জয়ানন্দ লিখিয়াছেন—

শ্রীপাদ নিত্যানন্দের বিবাহ

কথোদিনে নিত্যানন্দের শিখা সূত্র ধরি।
মহামল্ল বেশ ক্ষিতি পর্য্যটন করি॥

সূর্য্যদাস নন্দিনী শ্রীবসু জাহ্নবী।
পাণি গ্রহণ করিলেন স্বচ্ছন্দ কৌতুকী॥
বসুগর্ভে প্রকাশ গোসাঞি বীরভদ্র।
জাহ্নবী নন্দন রামভদ্র মহামর্দ্দ॥
—(চৈঃ মঃ—উত্তর খণ্ড)

* * *

লোকশাস্ত্রমতে সূর্য্যদাস ভাগ্যবান।
নিত্যানন্দচন্দ্রে দুই কন্যা কৈল দান॥
—(ভক্তিরত্নাকর—দ্বাদশ তরঙ্গ)

মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের সময় বিষ্ণুপ্রিয়ার একটি মর্ম্মান্তিক আক্ষেপ এইরূপ—

এইতো দারুণ শেল রইল সম্প্রতি।
পৃথিবীতে না রইল তোমার সন্ততি॥
—(লোচনের ভনিতাযুক্ত পদকল্পতরু—১৭৮৩ সংখ্যা)

* * *

শ্রীনিত্যানন্দ নিবাস করিলা খড়দহে।
মহাকুল যোগেশ্বর বংশ যাহে রহে॥
—(চৈঃ মঃ—উত্তর খণ্ড)

মহাপ্রভু ইচ্ছা করিয়াই তাঁহার বংশ লোপ করিলেন। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ইচ্ছা করিয়াই তাঁহার বংশ বিস্তার করিলেন। বৈষ্ণব-সমাজে মহাপ্রভু দিলেন সন্ন্যাসের আদর্শ। আর শ্রীপাদ নিত্যানন্দ দিলেন গার্হস্থ্যের আদর্শ। মহাপ্রভু যদি প্রয়োজনবোধে সন্ন্যাস নিয়া থাকেন, তবে প্রয়োজনবোধেই শ্রীপাদ গার্হস্থ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। আচার্য্য অদ্বৈত বহু পূর্ব্বেই, মাধবেন্দ্রপুরীর কথায়, একসঙ্গে দুই স্ত্রী বিবাহ করিয়া (শ্রী ও সীতা) গৃহী হইয়াছিলেন এবং আজীবন গৃহী ছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যের স্ত্রীর নাম মালিনী। তিনিও আজীবন গার্হস্থ্য পালন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু যদিও সন্ন্যাস

নিয়াছিলেন, তথাপি ভক্তিরত্নাকর মহাপ্রভুর পর পর দুই স্ত্রীর নাম উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে স্তব করিয়াছেন।—

জয় লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া নতি গৌরচন্দ্র।
জয় বসু জাহ্নবীর জীবন নিত্যানন্দ॥
জয় শ্রী সীতার নাথ অদ্বৈত ঈশ্বর।
জয় শ্রীবাস পণ্ডিত গদাধর॥

—(ভক্তিরত্নাকর—দ্বাদশ তরঙ্গ)

মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের সময় পণ্ডিত গদাধর এই বলিয়া আপত্তি করিয়াছিলেন যে—"তোমার মতে কি গৃহস্থ বৈষ্ণব নাই?" ইহার অর্থ, গৃহস্থ অবশ্যই বৈষ্ণব হইতে পারে। প্রাক্-চৈতন্য প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবেরা সকলেই গৃহী ছিলেন। গার্হস্থ্য—সমাজ-জীবনের স্বাভাবিক অবস্থা। সন্ন্যাস অপেক্ষা গার্হস্থ্য, সমাজ-জীবনকে অধিকতর সুস্থ রাখে। দেশশুদ্ধ সকল আহাম্মকে মিলিয়া সন্ন্যাস নিলে সে-দেশের অধঃপতন হয়।

মহাপ্রভুর তিরোভাব সম্পর্কে চৈতন্যভাগবত (বৃন্দাবনদাস) এবং চৈতন্যচরিতামৃত (কবিরাজ গোস্বামী) উভয়েই সম্পূর্ণ নিঃশব্দ, নীরব। এক্ষেত্রে জয়ানন্দ ও লোচন কিছুটা উল্লেখ করিয়াছেন। জয়ানন্দ বলিতেছেন—

আষাঢ় বঞ্চিত রথ বিজয় নাচিতে।
ইটাল বাজিল বাম পাত্র আচম্বিতে॥
সেই লক্ষ্য টোটায় শয়ন অবশেষে।

—(চৈঃ মঃ—উত্তর খণ্ড)

তারপর গরুড়ধ্বজ রথে চড়িয়া শ্রীচৈতন্যদেব চলিয়া গেলেন। এই তিরোভাবের তারিখ ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুন। আবার এই তিরোভাব সম্বন্ধে লোচন বলেন—

আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে ॥
তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে ॥
—(চৈঃ মঃ—শেষ খণ্ড)

মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের সময় শ্রীপাদ নিত্যানন্দ গৌড়দেশে আচণ্ডালে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচারকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। এইবার নীলাচল হইতে গৌড়দেশে সংবাদ আসিল যে—

চৈতন্য বৈকুণ্ঠ গেলা জম্বুদ্বীপ ছাড়ি।

তারপর—

"চৈতন্য বৈকুণ্ঠ গেলা জম্বুদ্বীপ ছাড়ি"

অনেক সেবক সর্প দংশাইঞা মৈল।
উল্কাপাত বজ্রপাত ভূমিকম্প হৈল ॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি শুনি।
বিষ্ণুপ্রিয়া মূর্চ্ছা গেলা শচী ঠাকুরাণী ॥
—(চৈঃ মঃ—উত্তর খণ্ড)

বিষ্ণুপ্রিয়া ও শচীমাতার অবস্থা বর্ণনার অতীত বলিয়াই কোন গ্রন্থকর্ত্তা উহা বর্ণনা করিবার চেষ্টামাত্র করেন নাই। চৈতন্যবিজয় শুনিয়া শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রথমে সপারিষদ নিঃশব্দ হইলেন। পরে কী করিয়া, কবে, কীরূপে অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন—জিজ্ঞাসা করিলেন।—

চৈতন্যবিজয় লীলা করিলা শ্রবণ।
—(চৈঃ মঃ—উত্তর খণ্ড)

শ্রীপাদ নিত্যানন্দে ইহার প্রতিক্রিয়া

তারপর পাছে মহাপ্রভুর তিরোভাবে বৈষ্ণবেরা হতাশ হইয়া পড়েন, প্রচারে বাধা আসে, তাই গম্ভীর স্বরে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ঘোষণা করিলেন—

নিত্যানন্দ স্বরূপ সে যদি নাম ধরোঁ।
আচণ্ডাল আদি যদি বৈষ্ণব না করোঁ ॥

জাতি ভেদ না করিব চণ্ডাল যবনে।
প্রেমভক্তি দিঞা সভায় নাচামু কীর্ত্তনে॥
কুলবধূ নাচাইমু কীর্ত্তনানন্দে।
অন্ধ বধির পঙ্গু নাচিবে স্বচ্ছন্দে॥
অদ্বৈত আইমু চৈতন্য ন আইমু সে চৈতন্য।
গৌড় উৎকল রাজ্য করিমু ধন্য ধন্য॥
—(চৈঃ মঃ—উত্তর খণ্ড)

মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের পরমুহূর্ত্তেই শ্রীপাদ নিত্যানন্দের মুখে বাঙালীর বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মর্ম্মকথা আবার দ্বিগুণ উৎসাহে ঘোষিত হইল। চণ্ডালে যবনে, যে বৈষ্ণব সে জাতিভেদ করিবে না—কুলবধূ কীর্ত্তন-আনন্দে নাচিবে; অন্ধ, বধির ও পঙ্গু স্বচ্ছন্দে নাচিবে; গৌড় ও উৎকল রাজ্য ধন্য ধন্য হইবে।

বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী কান পাতিয়া শ্রীপাদ নিত্যানন্দের এই অভিভাষণ শুন, আর ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যদেবের গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মে বাঙ্গালীর "সে বজ্রনির্ঘোষে কি ছিল বারতা" নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা কর।

রায় রামানন্দ

[জন্ম—১৪০০ খৃঃ'র মধ্যভাগ ॥ মৃত্যু, আনু.—১৫৩৪ খৃঃ]

॥ রায় রামানন্দ ॥

"কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥"

মহাপ্রভু ১৫১০।২৯শে মাঘ সংক্রান্তির দিন প্রাতে কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। পরে হরিদাসের ফুলিয়া ও শান্তিপুরে আচার্য্য অদ্বৈতের গৃহে শচীমাতার সহিত পরামর্শ করিয়া ফাল্গুনের শেষে নীলাচলে আসিয়া দোলযাত্রা দেখিলেন।—

ফাল্গুনে আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস।
* * *
ফাল্গুনের শেষে দোলযাত্রা সে দেখিল।
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ৭ম পঃ)

মহাপ্রভু সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়াছেন—গেরুয়া বসন পরিধান করিয়াছেন।—

"ছেঁড়া-কাঁথা মুড়ো মাথা করঙ্গ লইয়া হাতে।"

জয়ানন্দ বিষ্ণুপ্রিয়াকে দিয়া বিলাপ করাইতেছেন।—

সে হেন চাঁচর কেশে কি কৈলে গোসাঞি।
* * *
সোনার অঙ্গে রাঙ্গা বসন কেমন শোভা করে।
* * *
আর না দেখিব তোমার সরু পৈতা কান্ধে।
আর না দেখিব তোমার কেশের তেন ছান্দে॥
—(চৈঃ মঃ—সন্ন্যাস খণ্ড)

প্রাক্-চৈতন্য গৃহী-বৈষ্ণব আচার্য্য অদ্বৈত ও শ্রীবাস আচার্য্য মহাপ্রভুর সঙ্গে নীলাচল আসিলেন না। সন্ন্যাসের সময় গদাধর

পণ্ডিত স্পষ্টই আপত্তি করিয়া মহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন—"তোমার মতে কি গৃহস্থ বৈষ্ণব নাই?" অর্থাৎ, গৃহস্থ-বৈষ্ণবও আছে। আচার্য্য অদ্বৈত বলিয়াছিলেন—"ঈশ্বরে বৈরাগ্য কেন করে?" হরিদাস করুণ বচনে বলিলেন—"নীলাচলে যাবে তুমি মোর কোন গতি?" প্রভু বলিলেন—"তোমা লঞা যাব আমি শ্রীপুরুষোত্তম।" সম্ভবতঃ যবন হরিদাস মহাপ্রভুর সঙ্গেই নীলাচল আসিয়াছিলেন। মহাপ্রভু যখন নীলাচলে গিয়া উপনীত হইলেন, রাজা প্রতাপরুদ্র তখন নীলাচলে ছিলেন না। যুদ্ধ করিতে বিজয়নগরে গিয়াছিলেন।—

মহাপ্রভুর নীলাচলে আগমনের সময়ের অবস্থা

যে সময়ে ঈশ্বর আইলা নীলাচলে।
তখন প্রতাপরুদ্র নাহিক উৎকলে॥
যুদ্ধ রসে গিয়াছেন বিজয়নগরে।
—(চৈঃ ভাঃ—অন্ত্য, ২য় অঃ)

তা'ছাড়া, সমগ্র উৎকলে তখন বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণে বিষম রেষারেষি ও দলাদলি চলিতেছিল। রাজা প্রথমে বৌদ্ধদের পক্ষ নিয়াছিলেন। পরে অতিমাত্রায় বৌদ্ধ-বিদ্বেষী হইয়া বৌদ্ধদের রাজসভা ও রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিলেন। তাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থগুলি পর্য্যন্ত পুড়াইয়া ফেলিলেন। অথচ পুরাপুরি ব্রাহ্মণদের পক্ষও অবলম্বন করিলেন না। সেই সন্ধিক্ষণে মহাপ্রভু গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের পতাকাহস্তে নীলাচলে আসিয়া উপনীত হইলেন। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সঙ্গে ছিলেন।

নীলাচলে আসিয়াই মহাপ্রভু বাসুদেব সার্ব্বভৌমের সহিত একটা শাস্ত্র-বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। এবং সার্ব্বভৌমকে বিচারে পরাস্ত করিলেন।* শুধু পরাস্ত করিলেন না, তাঁহাকে ভাবাবেশে ঐশ্বর্য্য দেখাইলেন। সার্ব্বভৌম মূর্চ্ছিত হইলেন।

* কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"চৈতন্য লীলার ব্যাস দাস বৃন্দাবন।
তাঁহার আজ্ঞায় করি তাঁর উচ্ছিষ্ট চর্ব্বণ॥"

কিন্তু সার্ব্বভৌম-মিলন সম্পর্কে কবিরাজ গোস্বামী জ্ঞাতসারে বৃন্দাবনদাস

তারপর বেদান্ত ছাড়িয়া মহাপ্রভু কৃষ্ণকথা শুনিতে চাহিলেন। সার্ব্বভৌম বলিলেন—কৃষ্ণকথা "আমি কিছু নাহি জানি, সব জানে রায়।"

রায় রামানন্দ—যিনি গোদাবরীতীরে আছেন, রাজার একজন বিশিষ্ট অমাত্য—তিনি এই রাধাকৃষ্ণ-কথা ও রসতত্ত্ব বিষয়ে অতিশয় প্রাজ্ঞ। তিনি ইহা সমস্তই বলিতে পারিবেন। অতএব, আমার অনুরোধ—তুমি একবার তাঁর কাছে গিয়া সাক্ষাৎ কর।

সার্ব্বভৌম প্রভুকে স্পষ্ট বলিয়া দিলেন।—

রামানন্দ রায় আছে গোদাবরী তীরে।
অধিকারী হয়েন তিঁহো বিদ্যানগরে॥

হইতে শুধু পৃথক নয়, বিপরীত কথা লিখিয়াছেন। বৃন্দাবনদাসে আছে—ভাগবতের প্রসঙ্গ। আর কবিরাজ গোস্বামীতে আছে—বেদান্তের শাঙ্কর ভাষ্যের প্রসঙ্গ। দুই গ্রন্থ এক নয়, দুই বিচার-পদ্ধতিও দুই গ্রন্থে এক নয়। বৃন্দাবন-দাস অঙ্কিত করিয়াছেন—আচার্য্য অদ্বৈতের শ্রীচৈতন্য, যিনি চক্রধারী, কৃষ্ণের অবতার। "সংকীর্ত্তন প্রারম্ভে মোহার অবতার।" "সাধু উদ্ধারিমু, দুষ্ট বিনাশিমু" —অবতারের উদ্দেশ্য। সার্ব্বভৌমকে তিনি ভাবাবেশে তাহাই বলিলেন।

কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী অঙ্কিত করিয়াছেন—রায় রামানন্দের শ্রীচৈতন্য। "রাধাভাবদ্যুতি সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণ স্বরূপং"। 'নিজরস আস্বাদন' অবতারের উদ্দেশ্য। নবদ্বীপ হইতে উড়িষ্যায় অবতারের রূপান্তর হইয়াছে। কেহ হয়ত বলিতে পারেন, ইহা ক্রমবিকাশ।

বৃন্দাবনদাসে পাই—মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমকে ষড়্ভুজ দেখাইলেন : রামলীলায় ধনুকধারী, কৃষ্ণলীলায় বংশীধারী, গৌরলীলায় করঙ্গধারী। নবদ্বীপে অদ্যাপি এই ঐতিহ্যই প্রচলিত আছে।

কিন্তু কবিরাজ গোস্বামীতে পাই—প্রথমে চতুর্ভুজ (নারায়ণ), পরে দ্বিভুজ 'শ্যামবংশীমুখ' ব্রজের শ্রীকৃষ্ণ।

[এ বিষয়ে আমি আমার 'বাংলা চরিত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য' (পৃঃ ২৩৮–২৪৬) গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।]

সার্ব্বভৌম কর্ত্তৃক মহাপ্রভুর নিকট রায় রামানন্দের পরিচয়

শূদ্র বিষয়ী জ্ঞানে উপেক্ষা না করিবে।
আমার বচনে তারে অবশ্য মিলিবে॥
তোমার সঙ্গের যোগ্য তিঁহো একজন।
পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তার সম॥
পাণ্ডিত্য ও ভক্তিরস দুহেঁর তিঁহো সীমা।
সম্ভাষিলে জানিবে তুমি তাঁহার মহিমা॥
অলৌকিক বাক্য চেষ্টা তাঁর না বুঝিয়া।
পরিহাস করিয়াছি তাঁরে বৈষ্ণব জানিয়া॥
তোমার প্রসাদে ইবে জানিনু তার তত্ত্ব।
সম্ভাষিলে জানিবে তার যেমন মহত্ত্ব॥
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ৭ম পঃ)

১৫১০।৭ই বৈশাখ প্রভু নীলাচল হইতে দাক্ষিণাত্যে প্রচারের জন্য বহির্গত হইলেন। সন্ন্যাস লওয়ার পর প্রভুর এই প্রথম প্রচার। এবং শেষ প্রচারও বটে। পুরী হইতে গোদাবরীতীর—বিদ্যানগর যাইতে যে-কয়দিন লাগে, সেই কয়দিন পরেই রায় রামানন্দের সহিত প্রভুর সাক্ষাৎ হইল। এবং রসতত্ত্বেরও আলোচনা হইল। চৈতন্য-চরিতামৃতে এই ঘটনা সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। কবিরাজ গোস্বামী, দামোদর স্বরূপের করচা অনুসারে ইহা লিখিয়াছেন*।—

স্বরূপ দামোদরের করচা অনুসারে।
রামানন্দ মিলন কথা করিল প্রচারে॥
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ৯ম পঃ)

রামানন্দ রায়ের সহিত মহাপ্রভুর প্রথম মিলন

রামানন্দ রায় দোলায় চড়িয়া নদীতে স্নান করিতে আসিয়াছেন। সঙ্গে ব্রাহ্মণাদি একসহস্র ব্যক্তি। বাদকেরা বাজনা বাজাইতেছে। বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ সঙ্গে আসিয়াছেন। বিধিমত তর্পনাদি করা সমস্ত শেষ হইল। প্রভুই প্রথম রায়কে দেখিতে পাইলেন। এবং

* বহু চেষ্টা করিয়াও আমি দামোদর স্বরূপের করচা পাই নাই। উহা কোথাও পাওয়া যাইবে কি-না সন্দেহ।

দেখিয়াই চিনিলেন। শুধু চিনিয়া ক্ষান্ত হইলেন না। রায়ের সহিত মিলিত হইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইলেন। কিন্তু অপেক্ষা করিলেন।

এইবার রায়ের দৃষ্টি প্রভুর উপর পতিত হইল।—

সূর্য্যশতসম কান্তি অরুণ বসন।
সুবলিত প্রকাণ্ড দেহ পদ্মলোচন॥
দেখিয়া তাঁহার মন হইল চমৎকার।
আসিয়া করিল দণ্ডবৎ নমস্কার॥

—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ৮ম পঃ)

প্রভু বসিয়া ছিলেন। উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নমস্কারের উত্তরে বলিলেন—'কহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ'। প্রভুর আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা হইল। তথাপি জিজ্ঞাসা করিলেন: তুমি কি রায় রামানন্দ ?

তিঁহো কহে হই মুঞি দাস, শূদ্র, মন্দ।

—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ৮ম পঃ)

তারপর প্রভু রায়কে তাঁর দুই বিশাল ভুজদ্বারা আলিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন।—

তবে তাঁরে কৈল প্রভু দৃঢ় আলিঙ্গন।

—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ৮ম পঃ)

কিন্তু এই আলিঙ্গন ব্যাপারটাকে বৈদিক ব্রাহ্মনগণ খুব সুস্থচিত্তে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। এই সমস্ত ব্রাহ্মণ রায়ের আশ্রিত। তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন যে, এই সন্ন্যাসীর তেজ ব্রহ্মসম। অথচ রামানন্দ জাতিতে শূদ্র, তাঁকে আলিঙ্গন করিয়া এই সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ ক্রন্দন করেন কেন?—ব্রাহ্মণেরা মনে মনে এইরূপ বিচার করিতে লাগিলেন।—

এই ত সন্ন্যাসীর তেজ দেখি ব্রহ্ম সম।
শূদ্রে আলিঙ্গিয়া কেন করেন ক্রন্দন॥
এই মহারাজ, মহাপণ্ডিত গম্ভীর।
সন্ন্যাসীর স্পর্শে মত্ত হইল অস্থির॥

—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ৮ম পঃ)

তারপর রায় ও প্রভু সুস্থ হইয়া উভয়ে সেইস্থানে উপবেশন করিলেন। প্রভু হাসিতে হাসিতে রায়কে বলিলেন যে, নীলাচলে সার্ব্বভৌম তোমার গুণের কথা সমস্তই আমাকে বলিয়াছে। এবং তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বিশেষভাবে বলিয়া দিয়াছে। তাই আমি এখানে আসিয়াছি। এবং আমার পরম সৌভাগ্য যে, অতি-অনায়াসেই আমি তোমার দর্শন লাভ করিলাম।—

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কহিল তোমার গুণে।
তোমারে মিলিতে মোরে করেছে যতনে ॥
তোমা মিলিবারে মোর এথা আগমন।
ভাল হইল, অনায়াসে পাইনু দরশন ॥
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ৮ম পঃ)

রায় বলিলেন: আমার প্রতি সার্ব্বভৌমের অপার অনুগ্রহ। তাই তিনি দয়া করিয়া আমার মঙ্গলের জন্য তোমাকে এখানে পাঠাইলেন। আমি রাজসেবক। বিষয়ী। শূদ্রাধম। আমি অস্পৃশ্য। তবু তুমি আমাকে স্পর্শ করিলে। ঘৃণা বা বেদভয় কিছুই গ্রাহ্য করিলে না। আমার মনুষ্যজন্ম আজ সফল হইল।—

সার্ব্বভৌম তোমার কৃপা তার এই চিহ্ন।
অস্পৃশ্য স্পর্শিলে হঞা তাঁর প্রেমাধীন।
কাঁহা তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর নারায়ণ।
কাঁহা মুঞি রাজসেবক বিষয়ী শূদ্রাধম।
মোর স্পর্শে না করিলে ঘৃণা বেদভয়।
তোমার কৃপায় তোমায় করায় সদয় ॥
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ৮ম পঃ)

এই সময় 'বৈদিক এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ' আসিয়া প্রভুকে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিল। প্রভু ব্রাহ্মণকে বৈষ্ণব জানিয়া নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন। তারপর ঈষৎ হাসিয়া রায়কে প্রভু বলিলেন—

তোমার মুখে কৃষ্ণ কথা শুনিতে হয় মন।
পুনরপি পাই যেন তোমার দরশন ॥
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ৮ম পঃ)

সন্ধ্যা সমাগত। রায় ও প্রভু উভয়েই উৎকণ্ঠিত। প্রভু সান্ধ্য স্নানকৃত্য সমাপনান্তে বসিয়া আছেন। এমন সময় রায় আসিয়া মিলিত হইলেন। এইবার রসতত্ত্বের প্রসঙ্গ আরম্ভ হইল। প্রসঙ্গের আরম্ভেই দেখিতে পাই যে, 'সাধ্য' অর্থাৎ সাধনার বস্তু কী—প্রভু রায়কে তাহাই জিজ্ঞাসা করিলেন।—

রায়ের সহিত সাধ্য-সাধন সম্পর্কে প্রভুর কথোপকথন

প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।
রায় কহে স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয় ॥
প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে কৃষ্ণ কর্ম্মার্পণ সর্ব্ব সাধ্য সার ॥
প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে স্বধর্ম্ম ত্যাগ ভক্তি সাধ্য সার ॥
প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানমিশ্রভক্তি সাধ্য সার ॥
প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানশূন্য ভক্তি সাধ্য সার ॥
প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে প্রেমভক্তি সর্ব্ব সাধ্য সার ॥
প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে দাস্য প্রেম সর্ব্ব সাধ্য সার ॥
প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে বাৎসল্য প্রেম সর্ব্বসাধ্য সার ॥
প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে কান্তভাব প্রেম সাধ্য সার ॥
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ৮ম পঃ)

ভগবান আমার কান্ত (আমার প্রণয়ী—lover)—এই ভাবে তাঁহাকে ভজনা করিবে। এবং এই ভজনই শ্রেষ্ঠ।

গতানুগতিক আচার-নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মকে বাহিরের বস্তু বলিয়া ('এহো বাহ্য') প্রভু উপেক্ষা করিলেন। কর্ম্ম ও জ্ঞান ছাড়িয়া দিয়া ভক্তি-মুখে কেবল রাগানুগমার্গে একটা গতি লক্ষ্য করা গেল। ইহা নূতন। বাসুদেব সার্ব্বভৌম ইহাকে 'অলৌকিক চেষ্টা' বলিয়া প্রথমে ভ্রম করিয়াছিলেন। দাস্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই তিনটি রসের উল্লেখ হইল। তার মধ্যে কান্তভাব, অর্থাৎ মধুর রসকেই প্রভু উত্তম বলিয়া স্বীকার করিলেন।

পরে রসতত্ত্বের সাধনাঙ্গে একটি বিশ্লেষণমূলক বিচার ও মীমাংসা হইল। রায় বলিলেন—

কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়।
কৃষ্ণ প্রাপ্তির তারতম্য বহুত আছয় ॥
কিন্তু যার যেই রস সেই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হঞা বিচারিলে আছে তারতম ॥
পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
এক দুই গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাড়য় ॥
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে সর্ব্ব রসে।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য গুণ মধুরেতে বৈসে ॥
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকালে আছে।
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে ॥
যদ্যপি সৌন্দর্য্য কৃষ্ণ মাধুর্য্যের ধুর্য্য।
ব্রজগোপীর সঙ্গে তাঁর বাড়য়ে মাধুর্য্য ॥

—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ৮ম পঃ)

এখানে দেখিতে পাইতেছি যে—ভগবানকে লাভ করিতে হইলে আচার-নির্দ্দিষ্ট বাহিরের ক্রিয়াকাণ্ডের কোনই প্রয়োজন নাই। রায় যখন জ্ঞানমিশ্র ভক্তির কথা বলিলেন, তখনও প্রভু সমান উত্তর দিলেন—'এহো বাহ্য'। তারপর জ্ঞান ছাড়া ভক্তির কথা যখন

রায় বলিলেন, তখন প্রভু বলিলেন: হ'তে পারে—'এহো হয়', কিন্তু ইহাই শেষ নয়। কর্ম্ম নাই, জ্ঞান নাই—শুধু ভক্তি, প্রেম ও রস। ভগবানের সঙ্গে জীবের রসের সম্পর্কই সবচেয়ে বড় সম্পর্ক। আর এই রসের বিচারে, রায় বলিলেন যে—প্রত্যেক পূর্ব্ববর্ত্তী রসের গুণ পরবর্ত্তী রসে গিয়া সঞ্চারিত হয়। প্রত্যেক পরবর্ত্তী রস পূর্ব্ববর্ত্তী রসের গুণের দ্বারা পরিপূর্ণ হওয়াতে স্বাদেরও আধিক্য হয়। সুতরাং সর্ব্বশেষ মধুর রসে পূর্ব্ববর্ত্তী অপর চারি রসের গুণ থাকাতে, মধুর রসই সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভগবানের সহিত মধুর রসের সম্পর্কে সম্পর্কিত হইয়া, কর্ম্ম ও জ্ঞান ছাড়িয়া কেবল রাগমার্গে ভজন করিলেই জীব মনুষ্য জীবনের শ্রেষ্ঠ ফল লাভ করে। তবে একথাও রায় বলিলেন যে—যার যে রসে অধিকার, তার পক্ষে সেই রসই ভাল। রসের সাধনায়, সুতরাং, অধিকারীভেদ স্বীকার করা হইল। আর গীতার প্রতিধ্বনি করিয়া রায় ইহাও বলিলেন যে—অধিকারীভেদে, যে-ভক্ত যে-রস অবলম্বন করিয়া ভজিবেন, কৃষ্ণ সেই ভজনাতেই তাহাকে সার্থক ও চরিতার্থ করিবেন। ইহাই 'সাধ্য', অর্থাৎ সাধনার বিষয়। তারপর—

প্রভু কহে এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়॥
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ৮ম পঃ)

"রায় কহে ইহার আগে পুছে হেন জনে—এতদিনে নাহি জানি আছয়ে ভুবনে"

রায় আশ্চর্য্য হইলেন। এতদিন ধরিয়া রসের কারবার তিনি করিতেছেন। কিন্তু এর পরেও জিজ্ঞাসা করিতে পারে—পৃথিবীতে এমন লোক আছে, তিনি ভাবিতেও পারেন নাই।—

রায় কহে ইহার আগে পুছে হেন জনে।
এতদিনে নাহি জানি আছয়ে ভুবনে॥
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ৮ম পঃ)

মহাপ্রভু যে এর পরের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, রায় তাহা ভাবেন নাই।

তারপর এই প্রশ্নের উত্তরে রায় রাধিকার প্রেমের কথা পাড়িলেন।—

রায় কহে তাহা শুন প্রেমের মহিমা।
ত্রিজগতে রাধাপ্রেমের নাহিক উপমা॥
গোপীগণের রাস নৃত্য মণ্ডলী ছাড়িয়া।
রাধা চাহি বনে ফিরে বিলাপ করিয়া॥

—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ৮ম পঃ)

* * *

শত কোটি গোপীতে নহে কাম নির্ব্বাপন।
তাহাতে অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ॥

—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ৮ম পঃ)

রায়ের কথায় প্রভু সন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন—যে জন্য তোমার কাছে আসা, তা আমার সার্থক হইল। কৃপা করিয়া আর একটু বল। কৃষ্ণের স্বরূপ কিরূপ, আর রাধার স্বরূপই বা কিরূপ ?—

রস কোন তত্ত্ব, প্রেম কোন তত্ত্ব রূপ ?

—(চৈঃ চঃ—পৃঃ ১৪২)

রায় বলিলেন-

কৃষ্ণের স্বরূপ

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
সর্ব্ব অবতরি সর্ব্ব কারণ প্রধান॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড হই সবার আধার॥
সচ্চিদানন্দ তনু ব্রজেন্দ্র নন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য সর্ব্বশক্তি সর্ব্বরসপূর্ণ॥
বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কামগায়ত্রী কামবীজে যার উপাসন॥

আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন।
আপনা আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন॥
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ৮ম পঃ)

*　　*　　*

রূপ দেখি আপনার　কৃষ্ণের হইল চমৎকার
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ৮ম পঃ)

এইরূপে কৃষ্ণের স্বরূপ রায় বর্ণনা করিলেন। তারপর রাধার স্বরূপের কথা উঠিল। রাধা, কৃষ্ণ ছাড়া নয়। বস্তু ও তার গুণ যেমন অভেদ, কৃষ্ণ ও রাধা তেমনি অভেদ। রাধা—কৃষ্ণের শক্তি। ভগবানের শক্তির নাম রাধা। রায় কহিলেন—

সচ্চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপ শক্তি হয় তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিত যারে জ্ঞান করি মানি॥
কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী।
সেই শক্তি দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥
হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ চিন্ময় রূপ রসের আখ্যান॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধাঠাকুরাণী॥
সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সার।
কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য তার॥
মহাভাবচিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তাঁর কার্য্য ব্যূহরূপ॥
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ৮ম পঃ)

মহাভাবচিন্তামণি রাধিকার স্বরূপ

মহাভাবচিন্তামণিই রাধার স্বরূপ। সখীরা রাধিকার লীলার সহচরী। কৃষ্ণের বাঞ্ছা পূর্ণ করাই তাঁর কার্য্য।

রাধিকা কিলকিঞ্চিতাদি বিংশ প্রকারের ভাব-ভূষণ অঙ্গে পরিধান করিয়া, তাম্বুল রাগে অধর রঞ্জিত করিয়া, নেত্রযুগলে প্রেমকৌটিল্য কজ্জল মাখিয়া, মধ্যবয়স্কা দুই সখীর স্কন্ধে ভর করিয়া, কুঞ্জাভিসারে ধীরে অগ্রসর হইবেন। কিন্তু কিলকিঞ্চিতাদি ভাবটি কী?

শ্রীরূপ গোস্বামী ব্যাখ্যা করিয়াছেন—ইহা শ্রীরাধিকার একটি দৃষ্টি। কৃষ্ণ রাধিকাকে, নির্জ্জনে নয়, অন্যের সম্মুখেই হঠাৎ আলিঙ্গন করিয়া ফেলিয়াছেন। শ্রীরাধিকা স্বভাবতঃই অপমান বোধ করিয়াছেন। তাঁহার ক্রোধ হইয়াছে। হইবারই কথা। লজ্জাও হইয়াছে—কেননা, অপরে দেখিয়াছে। অপমান, ক্রোধ, লজ্জা মিশিয়া চোখে এক ফোঁটা জলও আসিয়াছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও রাধিকা মনের মধ্যে একটা গৌরবও অনুভব করিতেছেন—আমায় কত ভালবাসেন, এই ভাবিয়া। গৌরবের অনুভূতিতে দৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়াছে। লজ্জায় কথা বলিতে পারিতেছেন না, সম্পূর্ণ চোখ মেলিয়া চাহিতেও পারিতেছেন না। দৃষ্টি আধফোটা পদ্মের দুইটি পাঁপড়ির মত ঈষৎ রক্তিমাভ—কেননা, ক্রোধ আছে। দৃষ্টি বঙ্কিম। এই অপাঙ্গদৃষ্টি কিলকিঞ্চিতাদি ভাবের প্রকাশক। এক সঙ্গে অপমান, লজ্জা, ক্রোধ, গৌরব, অনুরাগ প্রভৃতি সাতটি ভাব যে দৃষ্টিতে প্রকাশ পায়—ইহা সেই দৃষ্টি। শ্রীরূপ গোস্বামী এই দৃষ্টিকে 'স্তবকিনী' আখ্যা দিয়াছেন।

কিলকিঞ্চিতাদি ভাব—
'স্তবকিনী' দৃষ্টি

চোখে এমনি ভাবের চাহনি লইয়া শ্রীরাধিকা, কুঞ্জে প্রবেশ করিবেন। কৃষ্ণকে শ্যামরস ও মধুপান অর্থাৎ শৃঙ্গাররস ও মদ্যপান করাইবেন। এবং সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ে তার কামনা পূর্ণ করিবেন।—

কৃষ্ণকে করায় শ্যামরস মধুপান।
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্ব কাম॥

—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ৮ম পঃ)

রাধিকা কী রকম ? না—

যাহার সৌভাগ্য গুণ বাঞ্ছে সত্যভামা।
যার ঠাঞি কলাবিলাস শিক্ষে ব্রজরামা॥
যার সৌন্দর্য্যাদি গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী-পার্ব্বতী।
যার পতিব্রতা ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী॥
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ৮ম পঃ)

শ্রীরাধিকার পাতিব্রত্যের উল্লেখ লক্ষ্য করিবার বিষয়। স্বকীয়া অপেক্ষা পরকীয়ার পাতিব্রত্য শ্রেষ্ঠ। আচার অপেক্ষা স্বাধীন ভালবাসা বড়। স্বাধীনতাই প্রেমের পাদপীঠ।

প্রভু শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন : কৃষ্ণ-রাধা প্রেমতত্ত্ব জানিলাম। এখন দুইজনের বিলাস-মহত্ত্ব শুনিতে চাই।—

রায় কহে কৃষ্ণ হয় ধীর ললিত।
নিরন্তর কাম ক্রীড়া যাঁহার চরিত॥
রাত্রিদিন কুঞ্জে ক্রীড়া করে রাধা সঙ্গে।
কৈশোর বয়স সফল কৈল ক্রীড়া রঙ্গে॥
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ৮ম পঃ)

প্রভু বলিলেন : এ উত্তম—আর একটু আগে বল।—

প্রভু কহে এই হয় আগে কহ আর।
রায় কহে ইহা বই বুদ্ধি গতি নাহি আর॥
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ৮ম পঃ)

প্রভু স্পষ্টই সম্ভোগের বর্ণনা শুনিতে অভিলাষী।

এইবার মহাপ্রভুর প্রশ্নে রায় প্রায় হাল ছাড়িয়া দিবার জোগাড়। বলিলেন—আর কথা চলে না। প্রেম-বিলাস-বিবর্তের একটা গীত আমি রচনা করিয়াছি। তাতে তোমার সুখ হয়, কি, না-হয় জানি না। যদি বল, তবে গাই। রায় গাহিলেন—

পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাড়ল অবধি না গেল॥

না সো রমন, না হাম রমণী।
দুঁহু মন মনোভাব পেশল জানি॥
এ সখি সো সব প্রেম কাহিনী।
কানুঠামে কহবি বিছুরল জানি॥
না খোঁজলুঁ দূতী, না খোঁজলুঁ আন।
দুহুঁ কো মিলনে মধ্যেত পাঁচ বান॥
অব সোই বিরাগ তুহুঁ ভেলি দূতী।
সুপুরুখ প্রেমক ঐছন রীতি॥

—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ৮ম পঃ)

সম্ভোগের জয়দেব-বর্ণিত দৈহিক বর্ণনা ছাড়িয়া মনোরাজ্যে রায় বিলাস-বিবর্ত্তকে প্রতিষ্ঠা করিলেন। জয়দেব অপেক্ষা রায়ের এইখানে উৎকর্ষ্য। প্রভু ধৈর্য্য ধরিয়া এই গীত শুনিতে পারিলেন না। রাধাপ্রেমের আবেশ হইল। তিনি গান বন্ধ করিবার জন্য হাত দিয়া রায়ের মুখ আচ্ছাদন করিলেন।—

প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল॥

—(চৈঃ চঃ—পৃঃ ১৪৫)

প্রভু রায়কে বলিলেন—তোমার দয়ায় সাধনার বস্তু যে কী, তা বুঝিলাম। এখন তা' পাইবার উপায় আমাকে বল।

এর আগে রায় বলিয়াছেন যে—ভগবানের সঙ্গে জীবের রসের সম্পর্কই সত্য। সেই রসের সম্পর্কের মধ্যে আবার মধুর রসের সম্পর্কই সর্ব্বোত্তম। মধুর রসের অবলম্বন হইতেছে—রাধাকৃষ্ণলীলা। দাস্য বাৎসল্যাদি রসে এই লীলার স্বাদ পাওয়া যায় না। কেবল সখিগণের ইহাতে অধিকার। সখীরাই এই লীলা পরিপুষ্ট করে, বিস্তার করে—এই লীলার মাধুরী আস্বাদন করে। রাধাকৃষ্ণ যে-কুঞ্জে বিহার করেন, সেই কুঞ্জ সেবার অধিকার কেবল এক সখিগণেরই আছে। অন্যান্য রসের অধিকারী যে ভক্তগণ, তাঁদের এই সর্ব্বোচ্চ অধিকার নাই। [illegible] ইহাই যদি বাঙালী বৈষ্ণবের ধর্ম্মের

তত্ত্বকথা হয়—তবে ইহার উপদেষ্টা রায় রামানন্দ, আর শ্রোতা মহাপ্রভু স্বয়ং নিজে। মহাপ্রভুর শেষ ১২ বৎসর দিব্যোন্মাদে এই ভাবই বিরহের আকারে প্রকাশ পাইয়াছে।—

রাধাকৃষ্ণ লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্য বাৎসল্যাদি ভাবে না হয় গোচর॥
সবে এক সখিগণের ইহা অধিকার।
সখী হইতে হয় এই লীলার বিস্তার॥
সখীভাব
সখী বিনা এই লীলা পুষ্ট নাহি হয়।
সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়॥
সখী বিনা এই লীলায় অন্যের নাহি গতি।
সখীভাবে যে তারে করে অনুগতি॥
রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জ সেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ৮ম পঃ)

বলিবার ভঙ্গীতে কোন অস্পষ্ট ইঙ্গিত নাই। রায় খুব স্পষ্ট করিয়াই প্রভুকে বলিতেছেন যে, সখীভাবে রাধাকৃষ্ণের সেবা করাই শ্রেষ্ঠ সাধনা। এখন, কাজেই দেখিতে হইবে সখী-ভাবটা কী? সখীর স্বভাব কিরূপ? এবং সখী কাজটা করে কী? কেননা, সখী-ভাব লইয়া যদি আমাকে ধর্ম্মসাধনা করিতে হয়—আর তাহাই যখন সর্ব্বোত্তম সাধনা—তাহা হইলে সখীর কর্ত্তব্য কী, তার একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকা অবশ্যই প্রয়োজন।

সুতরাং রায় এক্ষণে সখীর স্বভাব সম্বন্ধে প্রভুকে বলিতেছেন—

সখীর স্বভাব এই অকথ্যকথন।
কৃষ্ণসহ নিজ লীলায় নাহি সখীর মন॥
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ সুখ হৈতে তাতে কোটি সুখ পায়॥
রাধার স্বরূপ কৃষ্ণ প্রেম কল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা॥

কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়।
নিজ সুখ হৈতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয়॥
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ৮ম পঃ)

বিপরীত রকমের একটা বিষম ভাবিবার কথা আসিয়া পড়িল দেখা যাক্।

প্রসঙ্গ চলিতেছে রায় বলিতেছেন-

যদ্যপি সখীর কৃষ্ণ সঙ্গমে নাহি মন।
তথাপি রাধিকা যত্নে প্রেরি করায় সঙ্গম॥
নানাছলে কৃষ্ণ প্রেরি সঙ্গম করায়।
আত্মসুখ সঙ্গ হৈতে কোটি সুখ পায়॥
অন্যোন্য বিশুদ্ধ প্রেমে করে রস পুষ্ট।
তা সবার প্রেম দেখি কৃষ্ণ হয় তুষ্ট॥
সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কাম ক্রীড়া সাম্যে তার কহি কাম নাম॥
সেই গোপী ভাবামৃতে যার লোভ হয়।
বেদ ধর্ম্ম ত্যাজি সে কৃষ্ণকে ভজয়॥
রাগানুগমার্গে তাঁরে ভজে যেই জন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
ব্রজলোকের কোন ভাব লঞা যেই ভজে।
ভাব যজ্ঞ দেহ পাঞা কৃষ্ণ পায় ব্রজে॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত উপনিষৎ শ্রুতিগণ।
রাগমার্গে ভজি পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রিদিন চিন্ত্যে রাধাকৃষ্ণের বিহার॥
সিদ্ধদেহে চিন্তি করে তাহাই সেবন।
সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ॥
গোপী অনুগত বিনা ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে॥

তাহাতে দৃষ্টান্ত লক্ষ্মী করিল ভজন।
তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ৮ম পঃ)

কথাটা একরকম বুঝা গেল। সখী নিজে কৃষ্ণসঙ্গম করেন না। শ্রীরাধিকাকে যত্ন করিয়া কৃষ্ণসঙ্গম করান। এবং তাতে নিজের সঙ্গম-সুখ অপেক্ষা কোটিগুণে বেশী সুখ পান। এই সখী-ভাবে সাধন করিতে গেলে বেদধর্ম্ম, অর্থাৎ স্মৃতি-নির্দ্দিষ্ট সমাজ-ধর্ম্ম, এক কথায় কুল, ছাড়িতে হয়। শ্রীরাধা এবং সমস্ত সখীই কুলত্যাগিনী। তাতে তাঁরা দুঃখিত নন। কৃষ্ণের জন্য কুলত্যাগিনী ও কলঙ্কিনী হইয়া বরং তাঁহারা একটা আহ্লাদ ও গর্ব্ব অনুভব করেন। নিরন্তর অন্তরে রাধাকৃষ্ণের বিহার চিন্তা করিতে হয়—অন্য চারি রসে ইহা গোচরীভূত হয় না। যদিও নিজ ইন্দ্রিয়ের সুখ সখীদের উদ্দেশ্য নয়, কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-সুখই সখীদের উদ্দেশ্য ; তথাপি রাধিকাকে কৃষ্ণের সহিত সঙ্গম করাইয়া, তা দেখিয়া নিজেন্দ্রিয় সঙ্গম-সুখ অপেক্ষা কোটিগুণ অধিক সুখ আস্বাদন করে।—

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ৮ম পঃ)

কামদাবানল—রতি সে শীতল।
—(   )

আর সখীদের যে প্রেম, তা' কখনই প্রাকৃত কাম নহে। কেননা, যাহা কাম তাহা কামক্রীড়ার পরেই সাম্য হয়। সখীদের কামক্রীড়া নাই। কাজেই, সম্ভবতঃ তাহাদের প্রেমের কখনও সাম্য হয় না। এবং সেই জন্য সখীদের প্রেমকে—প্রাকৃত কাম বলা হয় না। "সহজে গোপীর প্রেম"—'সহজ' কথাটায় সহজিয়াদের কথাই মনে হয়।

রায়ের কথা শুনিয়া প্রভু পরম পরিতুষ্ট হইলেন। কেননা—

এত শুনি প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন।
দুই জনে গলাগলি করেন ক্রন্দন॥
—(চৈঃ চঃ—মধ্য ৮ম, পঃ)

মহাপ্রভু-চিহ্নিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মর্ম্মকথা আমরা রায় রামানন্দের কথোপকথনে স্পষ্টরূপে জানিতে পারিলাম। এবং এতক্ষণ যাহা বলা হইল, তাহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ভিতরকার কথা। তত্ত্বকথা।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রথমে রায়ের এইসব রসতত্ত্বের কথা শুনিয়া বুঝিতে পারেন নাই। অলৌকিক বলিয়া পরিহাস করিয়াছেন। শাঙ্কর বেদান্তীর পক্ষে করিবার কথাই।

আবার রামানন্দ ও মহাপ্রভুর প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসা যাক্। ইহার পরে রায় প্রভুর রূপান্তর দেখিতে পাইলেন। প্রভুর আর সন্ন্যাসী-মূর্ত্তি নাই। তার পরিবর্ত্তে 'শ্যামগোপরূপ' দেখিতেছেন। সম্মুখে 'কাঞ্চনপঞ্চালিকা'। তার গৌর কান্তিতে প্রভুর সর্ব্ব অঙ্গ ঢাকা। কাজেই রায় জিজ্ঞাসা করিলেন—ইহার অর্থ কী? প্রভু প্রথমে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। বলিলেন—রাধাকৃষ্ণে তোমার প্রেম অত্যন্ত গাঢ়। আর প্রেমের এই স্বভাব যে, স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি বাহ্য বস্তুতে প্রেমাস্পদকেই সে সর্ব্বক্ষণ দেখে।—

'শ্যামগোপরূপ'

শ্রীরাধাকৃষ্ণে তোমার মহাপ্রেম হয়।
যাঁহা তাঁহা রাধাকৃষ্ণ তোমারে স্ফুরয়॥
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ৮ম পঃ)

খুব সঙ্গত এবং স্বাভাবিক সহজ উত্তর। কিন্তু চৈতন্যচরিতকারের উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে প্রভুর এই উত্তর সাহায্য করে না। বিরোধ আনে। সুতরাং, রায় সন্তুষ্ট হইলেন না। বলিলেন—তুমি আমার সঙ্গে চাতুরী করিতেছ।

রায় কহে প্রভু মোরে ছাড় ভারিভুরি।
মোর আগে নিজ রূপ না করিহ চুরি॥
শ্রীরাধার ভাব কান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজরস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার॥
নিজ গূঢ় কার্য্য তোমার প্রেম আস্বাদন।
আনুসঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন॥
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ৮ম পঃ)

ধরা পড়ার পর আর চাতুরী চলে না।—

তবে হাসি তারে প্রভু দেখাল স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব তুই এক রূপ॥
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ৮ম পঃ)

একাধারে এই অভেদাত্মক যুগল রূপ দেখিয়া রায় উন্মত্তের মত ধরিতে গেলেন। কিন্তু পারিলেন না। মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রভু তাহাকে স্পর্শ করিয়া চেতন করিলেন। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন—

গৌর অঙ্গ নহে মোর, রাধাঙ্গ স্পর্শন।
গোপেন্দ্র সুত বিনা তিঁহো না স্পর্শে অন্যজন॥
তাঁর ভাবে ভাবিত করি আত্মমন।
তবে কৃষ্ণ মাধুর্য্য রস করি আস্বাদন॥
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ৮ম পঃ)

রায় যাহা সন্দেহ করিয়াছিলেন—প্রভু তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেন। এইখানে অরুন্ধতী অপেক্ষা শ্রীরাধিকার পাতিব্রত্যকে বড় করা হইয়াছে। প্রভু বলিলেন—হই আমি কৃষ্ণপ্রেমে কুলটা, এই কলঙ্কই আমার ভূষণ। তথাপি সেই লম্পট ব্যতিরেকে আর কেহ আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

এইরূপে দশ দিন বিদ্যানগরে থাকিয়া প্রভু রায়ের সহিত রসতত্ত্ব আলোচনা করিলেন। প্রভু বলিলেন—

যৈছে শুনিল তৈছে দেখিল তোমার মহিমা।
রাধাকৃষ্ণ প্রেমরস জ্ঞানে তুমি সীমা ॥
দশদিনের কা কথা যাবৎ আমি জীব।
তাবৎ তোমার সঙ্গ ছাড়িতে নারিব ॥
নীলাচলে তুমি আমি থাকিব একসঙ্গে।
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণ কথা রঙ্গে ॥
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ৮ম পঃ)

নবদ্বীপ-লীলায় আচার্য্য অদ্বৈতের ইহা অভিপ্রায় ছিল না। প্রভু যখন রায়ের মুখে কৃষ্ণকথা শুনিবার জন্য পুনঃ উৎকণ্ঠা ও আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন, তখন রায় কিঞ্চিৎ কুণ্ঠা প্রকাশ না-করিয়া পারেন নাই। কেননা, তিনি শূদ্র আর বিষয়ী, অর্থাৎ গৃহী। অন্যদিকে, প্রভু শুধু ব্রাহ্মণ নন্—সন্ন্যাসী। তখন যেমন ব্রাহ্মণে-শূদ্রে ভেদ ছিল, তেমনি গৃহী আর সন্ন্যাসীতেও ভেদ কম ছিল না। বরং খুব বেশীই ছিল।

রায়ের মুখে প্রভু নিজের স্তব শুনিয়া বলিলেন—আমাকে সন্ন্যাসী জানিয়া তুমি অনর্থক স্তবই বা কর কেন, আর নিজেকে শূদ্র ভাবিয়াই বা সঙ্কোচ বোধ কর কেন ?—

শূদ্র কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা হইলে গুরু হইতে পারে—রায়কে প্রভু গুরুর আসন দিতেছেন

তোমার ঠাঞি আইলাম তোমার মহিমা শুনিয়া।
তুমি মোরে স্তুতি কর সন্ন্যাসী জানিয়া ॥
কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয় ॥
সন্ন্যাসী বলিয়া মোরে না কর বঞ্চন।
কৃষ্ণরাধা তত্ত্ব কহি পূর্ণ কর মন ॥
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ৮ম পঃ)

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের আচারের বিরুদ্ধে ইহাই মহাপ্রভুর ধর্ম্মের অভিযান। ইহাই প্রশ্ন যে—'শূদ্র কেনে নয়'? শূদ্র যদি কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ হয়, তবে সে গুরু পর্য্যন্ত হইতে পারে—'চণ্ডালোঽপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠ'।

ইহাই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিরুদ্ধে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে মহাপ্রভুর বৈষ্ণব ধর্ম্মের এক স্মরণীয় এবং ইতিহাসে গৌরবান্বিত বিদ্রোহ।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, রায়কে প্রভু নিজে গুরুর আসন দিতেছেন—রায়ের কুণ্ঠা সত্ত্বেও। এবং রায়ও শেষে তাহা গ্রহণ করিতেছেন। রায় প্রভুর উপদেষ্টা এবং রসের সম্পর্কে তিনি সখা।

এইরূপে দশ দিন ধরিয়া রায়ের সহিত রসের আলোচনা হইবার পর, প্রভু দাক্ষিণাত্যে চলিয়া গেলেন। রায়কে বলিয়া গেলেন যে—ফিরিয়া আসিয়া তাঁহারা দুইজনে একসঙ্গে নীলাচলে বাস করিবেন এবং রাত্রিদিন কৃষ্ণকথা আলোচনা করিবেন। রায়ও এই কথায় রাজী হইলেন। কিন্তু নবদ্বীপ-লীলায় একথা ছিল না। ভিন্ন কথা ছিল।

১৫১০।৭ই বৈশাখ প্রভু পুরী হইতে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়েন। আবার ১৫১১।৩রা মাঘ নীলাচলে ফিরিয়া আসেন। ১ বৎসর ৮ মাস ২৬ দিন দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে কাটিয়া যায়।

ত্রিমন্দনগরে বৌদ্ধদের সহিত প্রভুর শাস্ত্র-বিচার

গোদাবরীতীরে রায় রামানন্দকে ছাড়িয়া প্রভু ত্রিমন্দনগরে গিয়া উপস্থিত হন। সেখানে বহু বৌদ্ধ বাস করেন। বৌদ্ধেরা আসিয়া প্রভুর সহিত ধর্ম্মের বিচার করিল। ঐদেশের যে রাজা, তিনি মধ্যস্থ হইলেন। বৌদ্ধেরা বিচারে পরাস্ত হইল।—

রায়ের নিকট হইতে লইয়া বিদায়।
ত্রিমন্দনগরে প্রভু প্রবেশ করয়॥
বহু বৌদ্ধ বাস করে ত্রিমন্দনগরে।
আসিয়া মিলিল সবে গৌরাঙ্গ সুন্দরে॥
বৌদ্ধগণসহ প্রভু বিচার করিলা।
ত্রিমন্দের রাজা আসি মধ্যস্থ হইলা॥
বৌদ্ধগণ বিচারেতে পরাস্ত মানিল।
পণ্ডিত দর্শক সবে হাসিতে লাগিল॥

—(গোবিন্দ দাসের করচা)

ত্রিমন্দনগর হইতেই গোবিন্দের হাতে প্রভুকে সমর্পণ করিয়া

আজ আমরা প্রত্যাবর্ত্তন করিব। প্রভুর সহিত আর বেশী দূর দক্ষিণে আমাদের যাওয়া চলিবে না।

নীলাচলে আসিয়াই বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণের দলাদলির মধ্যে মহাপ্রভু তাঁহার গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের আসন প্রতিষ্ঠা করিলেন। আবার এই ত্রিমন্দনগরেও বিশেষভাবে তাঁহাকে বৌদ্ধ পণ্ডিতদের সহিত ধর্ম্ম ও তর্ক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল। নীলাচলে আসিয়া মাত্র ২।৩ মাসের মধ্যেই প্রতাপরুদ্রের রাজসভায় বৌদ্ধদিগকে পরাস্ত, সার্ব্বভৌমকে অদ্বৈত বেদান্তে পরাস্ত, রায় রামানন্দকে উপদেষ্টা করিয়া রসতত্ত্ব ও সখীতত্ত্বের তাৎপর্য্য গ্রহণ, এবং দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসরপথে ত্রিমন্দনগরে আবার বৌদ্ধ-পণ্ডিতদিগকে পরাস্ত—তিনি করিলেন। অনুমান নয়, ইহা প্রত্যক্ষ যে—এইসময় তাঁহার প্রচার-কার্য্য অত্যন্ত দ্রুত চলিতেছিল। এই সময় হইতে ৭ বৎসর তাঁহার শরীর ও মনের বল অপরিমেয়, অব্যাহত ছিল। বৌদ্ধ পণ্ডিতদের সহিত বিভিন্ন স্থানে ও কালে প্রভুর যে-সব তর্ক হইয়াছিল, তার বিস্তৃত বিবরণ আমরা কোন গ্রন্থেই পাই না। কেবল পাই যে, তর্কে তিনি বৌদ্ধদের পরাস্ত করিয়াছিলেন এবং কোন কোন স্থানে বৌদ্ধদিগকে নিজের মতে আনয়ন করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যের যে-সমস্ত বৌদ্ধদের সহিত তিনি তর্ক করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ধর্ম্মমত ১৫১০ খৃষ্টাব্দে যে কিরূপ ছিল—তাহাও এখন নিশ্চয়রূপে জানিবার উপায় নাই। কেননা, দেশভেদে ও কালভেদে বৌদ্ধদের ধর্ম্মমত এক রকম ছিল না। নেপাল ও তিব্বতে এখনও 'মহাযান'-মত প্রচলিত। আবার লঙ্কাদ্বীপে 'হীনযান'-মত প্রচলিত। তিব্বতের বৌদ্ধেরা কালীপূজা করে, মন্ত্রতন্ত্রসহ হোম জপ করে, মানুষ পূজাও করে। চীনদেশের বৌদ্ধেরা সকল রকম মাংস খায়, এবং প্রাণী বধ করে। জাপানীরা বলে যে—মহাযান অপেক্ষাও তাদের ধর্ম্ম, হীনযান, দর্শনের দিক দিয়া অনেক উচ্চে—অথচ নানা রকম দেবদেবীর উপাসনাও তারা করে থাকে।

দেশভেদে কালভেদে বৌদ্ধধর্ম্মের বিভিন্ন মূর্ত্তি

বৌদ্ধ ধর্ম্ম যে কেবল বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মূর্ত্তিতেই প্রকাশ, তাই নয় এক বাঙলা দেশেই সমাজের বিভিন্ন অবস্থান-স্তরে বৌদ্ধ ধর্ম্মের আচার-ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন রকমের দেখা যায়। বিভিন্ন যুগেও বৌদ্ধ ধর্ম্মের আদর্শ একের পর আর পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

মহাপ্রভু যে কোন্ মতের বৌদ্ধদের সহিত কিরকম যুক্তি অবলম্বন করিয়া তর্ক করিয়াছিলেন এবং বৌদ্ধদিগকে বৈষ্ণব করিয়াছিলেন, তা আমরা জানি না। শঙ্করাচার্য্য তৎপ্রণীত তর্কপাদে বৌদ্ধদের শূন্যবাদকে 'বিনাশবাদ' বলিয়া উপহাস করিয়াছেন। নৈয়ায়িক-দিগকেও অর্দ্ধ-বিনাশবাদী বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন। কেননা, সুখ-দুঃখের নিবৃত্তিকেই নৈয়ায়িকেরা অপবর্গ বা মুক্তি বলিয়াছেন। সুখদুঃখ একেবারে না-থাকিলে, আত্মার অস্তিত্ব পাথরের মত হইয়া যায়। শূন্যের স্থানে শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন—জ্ঞানমার্গে মুক্তির পথ দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু মহাপ্রভু শূন্যের স্থানে রাধাকৃষ্ণের নিত্যবিহার কী যুক্তিতে প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং কী রকমেই বা জ্ঞান-কর্ম্ম ছাড়িয়া কেবল রাগানুগ ভক্তিমার্গে রাধাকৃষ্ণের বিহার চিন্তা করিয়া মধুর রসের রায় রামানন্দ-কথিত সখী-ভাবের মেয়েলী ভজন প্রবর্ত্তন করিলেন—তাহার বিবরণ আমরা কোন প্রামাণিক বৈষ্ণব-গ্রন্থে পাই না। ইহা পাওয়ার দরকার ছিল।

শঙ্করাচার্য্য ও বৌদ্ধ শূন্যবাদ

প্রতাপরুদ্রের পর, ১৫৫১ খৃষ্টাব্দে মুকুন্দদেব উড়িষ্যার রাজা হন। মগধ পর্য্যন্ত তাঁর রাজ্যের সীমা বিস্তৃত হয়। মুকুন্দদেব কিন্তু বৈষ্ণব ছিলেন না। তিনি আবার বৌদ্ধমতের খুব গোঁড়া ভক্ত হইয়া পড়িলেন। প্রতাপরুদ্রের সময় যেসকল বৌদ্ধ নির্য্যাতিত ও বিতাড়িত হইয়াছিল, মুকুন্দদেবের সময় আবার তাঁহারা রাজসভায় আসিয়া বেশ জাঁক করিয়া আসর জমাইয়া তুলিলেন। বলরামদাস—যিনি প্রতাপরুদ্রের সময় বৌদ্ধ নির্য্যাতনের ফলে রাজসভা পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, মুকুন্দদেব তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিলেন। শঙ্করের অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে বলরামদাস পুনরায় বৌদ্ধ শূন্যবাদ

প্রতিষ্ঠার প্রয়াস করিলেন। তাঁহার দার্শনিক মতবাদে ও কাব্যে, ইহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে—বলরামদাস বৈষ্ণব হইলেও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মাত্র। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, মহাপ্রভু ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে অপ্রকট হইবার পরে উৎকলে, অন্ততঃ রাজসভায়, বৌদ্ধদের পুনরাগমন একটা সত্যি ঘটনা এবং বড় ঘটনা। কেবল বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণে নয়—বৌদ্ধ এবং বৈষ্ণবেও দলাদলি, রেষারেষী চলিয়াছিল।

বৌদ্ধমতের যে-সমস্ত 'যান' আছে, সে সম্পর্কে আগেই বলিয়াছি যে—দেশভেদে ও যুগভেদে তা লোকের মনের ভাব বুঝিয়া পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বাঙলাদেশে, উড়িষ্যা ও দাক্ষিণাত্যে মহাপ্রভুর সময়ে কোথায় কোন্ কোন্ মতের বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল—তা বলিবার অবসর আজ হইবে না। তবে রায় রামানন্দ প্রভুকে যে মধুর রসের সখী-ভাবের ভজনের কথা বলিলেন—এবং প্রভুও যাহা গ্রহণ করিলেন—তাহার সহিত পূর্ব্বগামী বৌদ্ধ কোন প্রসিদ্ধ মত বা যানের সাদৃশ্য আছে কি-না একটু দেখা দরকার।

সকলেই জানেন, 'মহাযান' 'হীনযানে'র পরে দেখা দিয়াছে। হীনযান একেবারে শূন্যকেই নির্ব্বাণ বলে। এবং কেবল এক শূন্যে লীন হইবার জন্যই উপদেশ দেয়। জগতের উদ্ধার সম্পর্কে হীনযানীরা উদাসীন। মহাযানীরা প্রতিবাদ করিয়া বলেন—সে কী কথা! বুদ্ধদেব তো কেবল নিজের নির্ব্বাণ চান নাই। তিনি মগধের ও জগতের উদ্ধারের জন্য জীবনধারণ ও জীবনপাত করিয়াছেন। তিনি জগতের জন্য মহাকরুণায় আচ্ছন্ন ছিলেন। অতএব, নির্ব্বাণের সঙ্গে করুণাও থাকা চাই।—হীনযানে আর মহাযানে সংক্ষেপতঃ এই পার্থক্য।

হীনযান ও মহাযানে প্রভেদ

কিন্তু মহাযান মতের এই নির্ব্বাণলাভও সহজ ব্যাপার নয়। অনেক ধ্যান-ধারণা, সমাধি করিয়া—শূন্যের উপর শূন্য, তার উপর শূন্যে চড়িয়া তবে নির্ব্বাণ লাভ হয়। সুতরাং একটা সহজ পথের

প্রয়োজন লোকে অনুভব করিতে লাগিল। সাধারণ লোক শূন্য বুঝিতে পারিত না। কাজেই বৌদ্ধ ভিক্ষুরা শূন্যতার নাম দিলেন—'নিরাত্মা'। শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ। কাজেই নিরাত্মা দেবী হইলেন। এখন নির্ব্বাণ অর্থ, শূন্যতার মধ্যে লীন হইয়া যাওয়া। আর শূন্যতা যদি নিরাত্মা দেবী হইলেন, তবে তাঁর কোলে ঝাপাইয়া পড়ার নামই নির্ব্বাণ। পুরুষ স্ত্রীলোকের কোলে ঝাপাইয়া পড়িলে যাহা হয়, সাধারণ লোকে তা খুব স্পষ্টই বুঝিতে পারিল। নির্ব্বাণের শূন্যতা আর তত ফাঁকা বা শূন্য বোধ হইল না। মহাযান-মত খুব চলিল।

বৌদ্ধ সহজযান ও সহজিয়া সাধক-সাধিকা

কিন্তু আরও সহজ হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করা গেল। যাহারা এই প্রয়োজনমত উপদেশ দিলেন, তাহারা সহজবাদী। তাহাদের যানের নাম 'সহজযান'। তাহারা নির্ব্বাণের অবস্থাকে অস্তি নয়, নাস্তি নয়; তদুভয়ও নয়, অনুভয়ও নয়—এরূপ বলিলেন না। তাহারা বলিলেন—নির্ব্বাণের অবস্থায় আনন্দ মাত্র থাকে। এই আনন্দকে তাহারা সুখ বলেন—মহাসুখও বলেন। এবং এই সুখ স্ত্রী-পুরুষ সংযোগজনিত সুখ।

সহজবাদীরা বলিলেন—

রাগেন বধ্যতে লোকো রাগেনৈব বিমুচ্যতে।
বিপরীত ভাবনা হ্যেষা ন জ্ঞাতা বুদ্ধ তীর্থিকৈঃ॥
—(হেবজ্রতন্ত্র)

বিষয়ের আসক্তিতেই লোকে বদ্ধ হয়। আবার সেই আসক্তিতেই লোকে মুক্ত হয়। আসক্তির এই যে বিপরীত ফলদানের ক্ষমতা, বৌদ্ধেরা ইহা জানে না। আমরা সহজবাদীরাই কেবল ইহা জানি।

তাহারা আরও বলিলেন যে, ভোগ ত্যাগ করিবে না। পঞ্চকাম উপভোগ করার সঙ্গে সঙ্গেই বোধির সাধনা করিবে। আর ভোগের মধ্যে স্ত্রীসংযোগজনিত ভোগই সর্ব্বোত্তম। ইহাকে মহাসুখলীলা বলা হইয়াছে। এই মহাসুখলীলায় যার প্রতিষ্ঠা নাই, তার পক্ষে

নির্ব্বাণ লাভ অসম্ভব। নিরাত্মা দেবীকে কণ্ঠে ধারণ করিয়া, তাহার চিত্ত মহাসুখে লীন হইবে না। সে নির্ব্বাণ পাইবে না।

সাধারণ লোক মাতিয়া উঠিল। উঠিবারই কথা। মহাপ্রভুর বৈষ্ণবধর্ম্মেও একদিন বঙ্গ, উৎকল, এমন কি দাক্ষিণাত্যও মাতিয়া উঠিয়াছিল। সহজবাদীরা বৈষ্ণবদের মত গান গাহিয়া তাঁহাদের ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। নীরস উপদেশ অপেক্ষা ইহা আরও চিত্তাকর্ষক হইল। এইবার রূপক আরম্ভ হইল। বোধিসত্ত্ব ও নিরাত্মা দেবীর মিলনকে বিবাহ বলা হইল। তরুলতা সাজান হইল। হরিণ-হরিণীর ক্রীড়া চলিল। এ একরকম বৌদ্ধ-বৃন্দাবন। যেন বোধিসত্ত্ব হইলেন বৈষ্ণবদের কৃষ্ণ, আর নিরাত্মাদেবী হইলেন রাধিকা।

যাঁহারা এই সহজ মতের গুরু হইলেন তাঁহাদিগকে সিদ্ধাচার্য্য বলা হইত। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে—"এখন বৈষ্ণবদের যেমন আখড়াধারী আছে, সিদ্ধাচার্য্যেরা যদি তেমনি আখড়াধারী ছিলেন বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে তখন বাঙলার কিরূপ অবস্থা ছিল ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়।" ইহা একটা ঐতিহাসিক কল্পনা।

শাস্ত্রী মহাশয় আরও বলেন—

"ইহারা যে সহজ ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, সে ধর্ম্ম এখনও চলিতেছে। তবে ইহার রূপ বদলাইয়া গিয়াছে। তখন সহজিয়ারা আপনারাই সহজ-ভাবে মত্ত থাকিতেন। এখন সহজিয়ারা দেবতাদের সহজ-ভাবে ভোর হইয়া থাকেন। তখন তাঁহারা নিজেরাই যুগনদ্ধ ক্রীড়া করিতেন। এখন তাঁহারা দেবতাদের যুগনদ্ধ ক্রীড়া দেখিয়াই আনন্দ উপভোগ করেন।"

এই বৌদ্ধ সহজযান বাঙলায় ছিল। পাল রাজদিগের সময়েও ছিল। এখন, রায় রামানন্দ মহাপ্রভুকে যে সখীতত্ত্বের আরাধনার কথা বলিয়াছেন, তা আপনারা শুনিয়াছেন। কৃষ্ণসহ নিজ লীলায় সখীর মন নাই।—

কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ সুখ হৈতে তাতে কোটি সুখ পায়॥
—(চৈঃ চঃ)

আবার—

যদ্যপি সখীর কৃষ্ণ সঙ্গমে নাহি মন।
তথাপি রাধিকা যত্নে প্রেরি করায় সঙ্গম॥
নানা ছলে কৃষ্ণ প্রেরি সঙ্গম করায়।
আত্মসুখ সঙ্গ হৈতে কোটি সুখ পায়॥
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ৮ম পঃ)

মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের মত অনুসরণ করিলে এই সিদ্ধান্ত হয় যে—রায় রামানন্দ-কথিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মই বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্ম্ম। কেবল রূপ বদলাইয়াছে মাত্র। আগে সহজিয়ারা নিজেরা সহজ-ভাবে মত্ত থাকিতেন। এখন দেবতাদের (রাধা-কৃষ্ণের) সহজ-ভাবে ভোর হইয়া থাকেন।—কথাটা চিন্তা করিবার বিষয়।

রায় রামানন্দ-কথিত সখী-ভাবই বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্ম্ম—কেবল রূপান্তর হইয়াছে মাত্র

তবে এই যে রূপান্তর, ইহাও চারিটিখানি কথা নয়। নিজে যৌন ক্রীড়ায় মত্ত হওয়া আর তত্ত্বের দিক দিয়া কেবল রাধা-কৃষ্ণের যৌন ক্রীড়া অন্তরে চিন্তা করিয়া আনন্দ উপভোগ করা—মনোবিজ্ঞানের একই অনুভূতি বা আনন্দ নয়। এক শ্রেণীর কি-না তাহাও বিবেচ্য। অপরের যৌন ক্রীড়া দেখিয়া যে আনন্দ—রায় বলিতেছেন—তাহা নিজের যৌন ক্রীড়ার আনন্দ অপেক্ষা কোটি গুণে বেশী সুখদায়ক। আর সাধক নিজে ক্রীড়াসক্ত নয় বলিয়া ইহা—রায় বলিতেছেন—প্রাকৃত কাম নয়। ইহার কখনই সাম্য নাই। সুতরাং ইহা অপ্রাকৃত। ইহা ছিল, আছে এবং থাকিবে। ইহা Reality এবং Eternity.

প্রভুর নিকট রায় রামানন্দ-কথিত বৈষ্ণবধর্ম্ম যদি বৌদ্ধ সহজ-

যানের রূপান্তর মাত্র হয়—তবে ইহা সামান্য রূপান্তর নয়—যেহেতু বৌদ্ধ সহজিয়ারা নিজেরা যৌন ক্রীড়ায় মত্ত। আর বৈষ্ণবেরা সখী-ভাবের সাধনায় নিজেরা যৌনক্রীড়া হইতে সর্ব্বপ্রকার বঞ্চিত এবং দূরে অবস্থিত। এই কথাটার উপরেই বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কেননা, বৌদ্ধ সহজিয়া আর রামানন্দ-কথিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মে, ইহাই প্রভেদ। এবং খুব বড় রকমের প্রভেদ। উভয়ে এক বস্তু নয়।

বৌদ্ধ সহজিয়া ও সখী-ভাব, একবস্তু নয়

রায় রামানন্দ প্রসঙ্গে কেন যে বৌদ্ধ-মতের এত নানা রকমের কথা বলিতে হইল, তা আপনারা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিলেন। মনে হয়, ঐতিহাসিক পারম্পর্য্যের দিক হইতে এই কথাটির আরও বিজ্ঞানসম্মত বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। এই আলোচনার মধ্যে বাঙলার ইতিহাসের একটা বড় অধ্যায় প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

শ্রীরূপ গোস্বামী

[জন্ম—১৪৯০ খৃঃ ॥ মৃত্যু—১৫৬৩ খৃঃ ॥ ৭৪ বৎসর]

॥ শ্রীরূপ গোস্বামী ॥

"রামানন্দ পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিল।
রূপে কৃপা করি তাহা সব সঞ্চারিল॥"

১৫১৪ খৃষ্টাব্দ। আশ্বিনের শেষ কিংবা কার্ত্তিকের প্রথম। গৌড়ের নিকট রামকেলি গ্রামে শ্রীরূপ গোস্বামীর সহিত মহাপ্রভুর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ১৫১০ খৃঃ, ২৯শে মাঘ মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার বয়স ২৪ বৎসর শেষ হইতেছে। সন্ন্যাস লইয়া তিনি পুরী যান। ফাল্গুনের শেষে তিনি পুরীতে পৌছেন। দেড়মাস তথায় থাকিয়া ৭ই বৈশাখ দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বহির্গত হন। ১ বৎসর ৮ মাস ২৬ দিন পরে তিনি পুরীতে ফিরিয়া আসেন। এই গেল প্রথম দুই বৎসরের হিসাব।

বৃন্দাবন যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু রামানন্দ রায় যাইতে দেন নাই।

পঞ্চম বৎসরে—অর্থাৎ ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে, গৌড়ের ভক্তগণ রথযাত্রা দেখিতে পুরী আসিলেন এবং রথযাত্রা দেখিয়াই চলিয়া গেলেন। এই বৎসরে সার্ব্বভৌম ও রায় রামানন্দকে বুঝাইয়া বিজয়া দশমীর দিন গৌড়দেশ দিয়া বৃন্দাবন যাইবার উদ্দেশ্যে তিনি সন্ধ্যাকালে পুরী ত্যাগ করিলেন। এবং গৌড়ের নিকট রামকেলি গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভুর বয়স তখন ২৯ বৎসর চলিতেছে।

গৌড় তখন বাঙলার রাজধানী। ইহার অপর নাম লক্ষ্মণাবতী। বর্ত্তমান মালদহ জেলায় অবস্থিত। গৌড়েশ্বর হুসেন শা' তখন রাজত্ব করিতেছেন। Stewart-এর মতে ১৪৯৯—১৫২০ খৃঃ হুসেন শা'র রাজত্বকাল। কিন্তু Vincent Smith বলেন—১৪৯৩—১৫১৮ খৃঃ, ২৬ বৎসর তাঁহার রাজত্বকাল। ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে মহাপ্রভুর আগমনকালে—উভয়ের মতেই, হুসেন শা'-ই গৌড়ের অধিপতি।

প্রাজ্ঞ ঐতিহাসিকগণের বিবেচনায়, বাঙলার মুসলমান নরপতি-দিগের মধ্যে হুসেন শা' সবচেয়ে ক্ষমতাশালী, আর সবচেয়ে ভাল। তাঁহার রাজ্যশাসন প্রশংসনীয়। তিনি স্বভাবতঃ হিন্দুদিগের প্রতি উদার ছিলেন। বিশেষতঃ বাঙলা সাহিত্যের তিনি এত বড় উৎসাহদাতা ছিলেন যে, তাঁহার নামে যদি বাঙলা সাহিত্যের একটা যুগ চিহ্নিত হয় তবে 'অনুচিত হইবে না'—এরূপ সাহিত্যের কোন প্রসিদ্ধ ইতিহাস-লেখক মত প্রকাশ করিয়াছেন। হুসেন শা'র উৎসাহে কবীন্দ্র, পরমেশ্বর ও শ্রীকরণ নন্দী মহাভারতের অনুবাদ করেন। বিজয় গুপ্তের পদ্মা পুরাণ এবং অনেক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবগ্রন্থে গৌড়েশ্বর হুসেন শা'র নাম-যশঃ-কীর্ত্তি সম্ভ্রমের সহিত বর্ণিত আছে।

হুসেন শা' যখন গৌড়ের সিংহাসনে—দিল্লীর সিংহাসনে তখন সিকান্দার লোদী। তিনি ২৮ বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন (১৪৯১-১৫২০ খৃঃ)—Stewart-এর মতে। Elphinstone বলেন—সিকান্দারের মৃত্যু-তারিখ ১৫১৭ কিংবা ১৫১৮ খৃঃ। কিন্তু Vincent Smith বলেন—তিনি ১৫১৭ খৃঃ নভেম্বর মাসে মারা যান। Vincent Smith-এর গণনাই ঠিক। প্রায় সকল ঐতিহাসিকই বলেন যে—সিকান্দার বাদশা খুব হিন্দু-বিদ্বেষী ছিলেন। হিন্দুদের দেবদেবীমূর্ত্তি ও মন্দির যাহা যাহা পাইয়াছেন ও পারিয়াছেন, তাহা তিনি ভাঙ্গিয়াছেন। হিন্দুদের তীর্থযাত্রায় বাধা দিয়াছেন। আর বিশেষ বিশেষ পর্ব্বে পবিত্র নদনদীতে যাত্রীদের স্নান করিতে দেন নাই।

এক সময়ে তাঁহার রাজ্যে কোন এক ব্রাহ্মণ এইরূপ প্রচার করিতেছিলেন যে—"সমস্ত ধর্ম্মই, যদি অকপটে আচরণ করা হয়—তবে ঈশ্বর তাহা গ্রহণ করেন।" Elphinstone অনুমান করেন যে, ব্রাহ্মণটি কবীরের জনৈক শিষ্য—(অধ্যাপক উইলসন, Asiatic Researches; Vol. XVI, পৃঃ ৫৫ দ্রষ্টব্য)। Vincent Smith-এর মতে—কবীর ১৫১৮ খৃঃ দেহত্যাগ করেন।

তবেই দেখা যায়, তিনি সিকান্দার বাদশার সমকালীন। এবং কবীরের মৃত্যুর পরেও মহাপ্রভু পুরীতে ১৫ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন।

সিকান্দার এই ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া আনেন এবং তাঁহার এইরূপ কবীরপন্থী উদার ধর্ম্মমতের জন্য তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। এই ঘটনা ১৫১৪ খৃষ্টাব্দের বড় অধিক দূরে হইবে না। একজন মৌলভী সিকান্দার বাদশাকে বলিয়াছিলেন যে—তীর্থযাত্রী হিন্দুদের অত্যাচার করা উচিত নয়। ইহার উত্তরে বাদশা কোষ হইতে তরবারি খুলিয়া মৌলভীকে এই বলিয়া বধ করিতে গিয়াছিলেন যে—"পাপীষ্ঠ, তুমি মূর্ত্তিপূজা সমর্থন কর।" মৌলভী এই উত্তর দিয়া বাঁচিলেন যে—"না, তা নয়। আমার বক্তব্য এই যে, রাজা প্রজাকে অত্যাচার করিবে না।"

মহাপ্রভু যদি ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে রামকেলি না-আসিয়া দিল্লী যাইতেন, তবে সিকান্দার বাদশার দরবারে পূর্ব্বোক্ত কবীরপন্থী ব্রাহ্মণ প্রচারকের মত তাঁহার শিরশ্ছেদ হইলে, আশ্চর্য্য হইবার কিছু ছিল না।

এখন দেখা যাক্ এই সময়ে দিল্লীর সঙ্গে গৌড়ের সম্পর্ক কী?

তখন পাঠান আমল। সিকান্দার বাদশা ও হুসেন শা', উভয়েই আফগান পাঠান। 'হিন্দুস্থানে তখন পাঠান সাম্রাজ্য বলিয়া কিছু ছিল না। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজা ছিলেন। গৌড় তখন দিল্লীর অধীন নয়। সিকান্দার বাঙলা আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সুবিধা করিতে পারেন নাই। বার নামক স্থানে যে সন্ধি হয়, তাহাতে সিকান্দার বাঙলাকে স্বাধীন রাজ্য বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হন।

এইরূপ স্বাধীন বাঙলার রাজধানী গৌড়ের নিকট মহাপ্রভু আসিলেন। হুসেন শা'র সহিত দেখা করিতে তিনি আসেন নাই—তিনি আসিয়াছিলেন হুসেন শা'র দুই প্রধানমন্ত্রী সাকর মল্লিক ও দবীর খাস, শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন-এর সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিতে।

শুধু সাক্ষাৎ নয়, এই দুই প্রধান ক্ষমতাশালী রাজমন্ত্রীকে মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ করাইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করাইতে এবং তাঁহার দলভুক্ত করিতে। এই দুই রাজমন্ত্রীকে দিয়া মহাপ্রভু বৈষ্ণব শাস্ত্রগ্রন্থ লেখাইবেন এবং মথুরা ও বৃন্দাবন, এই দুই লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করিবেন—এ সঙ্কল্প পূর্ব্ব হইতেই প্রভুর মনে ছিল। এবং সাক্ষাতের সময় তিনি এই কথা স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছিলেন।

মহাপ্রভুর রামকেলি আসিবার উদ্দেশ্য কী

মহাপ্রভুর সহিত রামকেলিতে শ্রীরূপ-সনাতনের যে কথোপকথন হয়, তাতে দেখা যায় যে—শ্রীসনাতন প্রভুকে অনেকগুলি পত্র লিখিয়াছিলেন। এবং এই দুই মন্ত্রীর সহিত সকলের অজ্ঞাতে প্রভুর একটা গোপন পরামর্শ চলিতেছিল। রামকেলিতে আসা, এমন কি বৃন্দাবন যাইবার উদ্দেশ্যে গৌড়ে আসিবার প্রধান এবং একমাত্র কারণ—শ্রীরূপ শ্রীসনাতনকে মন্ত্রিত্ব ছাড়াইয়া, মহাপ্রভুর ধর্ম্মান্দোলনের কার্য্যে তাঁহাদের অসাধারণ প্রতিভা ও শক্তিকে নিয়োজিত করা। কেবল 'জননী ও জাহ্নবী' দেখিবার জন্য মহাপ্রভু ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে বাঙলায় আসেন নাই।

সে-কথা পরে হইতেছে। তার পূর্ব্বে সংক্ষেপে দেখা যাক্ উড়িষ্যা মহাপ্রভুকে ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে কীভাবে বিদায় দিল। দুই বৎসর পূর্ব্বে মহাপ্রভু যখন দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ শেষ করিয়া পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন হইতেই উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভুর একান্ত ভক্ত হইয়া পড়েন। উড়িষ্যাও স্বাধীন। দিল্লী বা গৌড় কাহারও অধীন নয়। গঙ্গাবংশীয় রাজা অনন্তবর্মন একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জগন্নাথদেবের বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করেন। মহাপ্রভুর সময়ে ঐ মন্দিরের বয়ঃক্রম ৪০০ বৎসরের অধিক হইবে না। বাঙলার সহিত উড়িষ্যার যুদ্ধ হইয়াছে ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু একে অন্যকে অধীনস্থ করিতে পারে নাই। পাঠান আমলের পর মোগল রাজত্বের গোড়াপত্তনে আকবর বাদশাই প্রথম বাঙলা ও উড়িষ্যাকে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এবং অধীন করেন। কিন্তু সে দুর্ঘটনা মহাপ্রভুর দেহত্যাগের

৪৩ বৎসর পরে। কালাপাহাড়ের অভিযানও আকবরের পূর্ব্বে সত্য, কিন্তু মহাপ্রভুর উড়িষ্যা-লীলার পরে।

১৫১৪ খৃষ্টাব্দে যখন স্থির হইল মহাপ্রভু গৌড়দেশ হইয়া বৃন্দাবন যাইবেন—তখন প্রতাপরুদ্র তাঁহার গমনের যে আয়োজন করিলেন, তাহা ৫০০ বৎসরের মধ্যে ২৯-বৎসর-বয়স্ক কোন বাঙালী যুবকের ভাগ্যে অদ্যাপিও ঘটে নাই।

প্রতাপরুদ্র ও মহাপ্রভু

রাজ্যমধ্যে মহাপ্রভুর বাঙলাদেশে গমনের সংবাদ ঘোষণা দ্বারা জানান হইল। প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীর নিকট আজ্ঞাপত্র পাঠান হইল। যে পথ দিয়া প্রভু যাইবেন, সেই পথে—

গ্রামে গ্রামে নূতন আবাস করিবা।
পাঁচ সাত নব্য গৃহে সামগ্রী ভরিবা॥
আপনি প্রভুকে লঞা তাঁহা উত্তরিবা।
রাত্রি দিবা বেত্রহস্তে সেবায় রহিবা॥
দুই মহাপাত্র* হরিচন্দন, সঙ্গরাজ।
তাঁরে আজ্ঞা দিল রাজা, কর সর্ব্বকাজ॥
এক নব্য নৌকা আনি রাখ নদী তীরে।
যাহা স্নান করি প্রভু যান নদী পারে॥
তাঁহা স্তম্ভ রোপণ কর মহাতীর্থ করি।
নিত্য স্নান করিব তাঁহা, তাঁহা যেন মরি॥
চতুর্দ্বারে† করহ উত্তম নব্য বাস।
রামানন্দ যাহ তুমি মহাপ্রভু পাশ॥
সন্ধ্যাতে চলিবে প্রভু নৃপতি শুনিল।
হস্তী উপর তাম্বু গৃহে স্ত্রীগণ চড়াল॥
প্রভু চলিবার পথে রহে সারি হঞা।
সন্ধ্যাতে চলিলা প্রভু নিজগণ লঞা॥

* সীমান্ত প্রদেশের শাসনকর্ত্তা।

† কটকের অপর পারে অবস্থিত চৌদুয়ার নামক গ্রাম।

চিত্রোৎপলা নদী আসি ঘাটে কৈল স্নান।
মহিষী সকল দেখে করয়ে প্রণাম॥
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ১৬শ পঃ)

ত্রিবাঙ্কুর-অধিপতি রুদ্রপতি ও মহাপ্রভু

চারি বৎসর পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে এক Travancore-এর রাজা রুদ্রপতির নিকট ভিন্ন, মহাপ্রভু আর কোন স্বাধীন রাজার নিকট এত বড় সম্মান পান নাই।—

সন্ন্যাসী হেরিতে চলে রাজা রুদ্র পতি।
ভক্তিভরে বাহিরিয়া আসে শীঘ্র গতি॥
হস্তী অশ্ব তেয়াগিয়া অতি দূর দেশে।
সন্ন্যাসীর কাছে আসে অতি দীন বেশে॥
—(গোঃ করচা—পৃঃ ৪৪)

উড়িষ্যা যদি সমস্ত ভারতবর্ষ হইত, তবে ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে ভারত-ইতিহাসে বৌদ্ধধর্ম্মের মত বৈষ্ণবধর্ম্মের এক পুনরাভিনয় দেখা যাইত, এবং প্রতাপরুদ্র সম্রাট অশোকের স্থান অধিকার করিতেন। কিন্তু ৩০০ বৎসর ব্যাপিয়া ধর্ম্মে ও রাষ্ট্রে হিন্দুস্থান—অর্দ্ধচন্দ্র শোভিত, মানবের ভ্রাতৃভাব ঘোষণাকারী, সাম্যবাদী, ইস্লাম পতাকাবাহী, এক অতি দুর্দ্দমনীয় মহিমু জাতির দ্বারা আচ্ছন্ন ও পর্য্যুদস্ত হইতেছিল। ব্রাহ্মণ-প্রধান হিন্দু-সমাজ এই গতি রোধ করিতে পারে নাই। রাজা রামমোহন রায় ১০০ বৎসরের অধিক পূর্ব্বে ইহার কারণ দেখাইতে গিয়া দুইটি বিশেষ কারণ উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম —"হিংসা ত্যাগকে ধর্ম্ম বলিয়া জানা।" দ্বিতীয়—"হিন্দু-সমাজের জাতিভেদ, যাহা সর্ব্বপ্রকার অনৈক্যতার মূল হয়।"—(ব্রাহ্মণ সেবধি, ১ম পৃঃ)।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে সমগ্র ভারতবর্ষ বৈষ্ণব হওয়ার আশা, দুরাশামাত্র। তথাপি এই দুরাশা মুষ্টিমেয় একদল বাঙালী মহাপ্রভুকে সম্মুখে রাখিয়া একদিন নবদ্বীপে শ্রীবাসের আঙ্গিনায়

দাঁড়াইয়া ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে পোষণ করিয়াছিল। আজ অতি-আধুনিক তরুণ বাঙলার কাছে তাহা স্বপন-কথা বলিয়া মনে হইবে।

সে-কথা থাক্। এখন প্রশ্ন : রায় রামানন্দ মহাপ্রভুর সঙ্গে কত দূর আসিয়াছিলেন? চৈতন্যচরিতামৃত প্রথম বলেন—ভদ্রক পর্য্যন্ত রায় আসিয়াছিলেন। পরে বলেন—রেমুনা পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। বালেশ্বরের ১৪ ক্রোশ দক্ষিণে ভদ্রক। আর ৩ ক্রোশ পূর্ব্বে রেমুনা। উড়িষ্যার প্রান্তসীমা পর্য্যন্ত প্রতাপরুদ্র তত্ত্বাবধান করিয়াছেন। তার পরে 'মন্ত্রেশ্বর দুষ্টনদ' পার হইয়া পিছলদায় পৌঁছিতে হইবে। কিন্তু উহা যবন অধিকারে। সেই যবনরাজ প্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। জলদস্যুর ভয়ে দশ নৌকা ভরিয়া সৈন্য লইয়া প্রভুকে নদী পার করাইল। মনে হয়, প্রভু নৌকাযোগে সুবর্ণরেখা দিয়া ক্রমে মন্ত্রেশ্বর নদী পার হইয়া পিছলদায় উপস্থিত হন। তথা হইতে যবন রাজাকে বিদায় দিয়া, নৌকাযোগে পাণিহাটী আসেন। অনুমান, সুবর্ণরেখার মুখ দিয়া বঙ্গোপসাগর পার হইয়া গঙ্গায় প্রবেশ করেন। ক্রমে কুমারহট্ট, ফুলিয়া, শান্তিপুর, রামকেলি, কানাইয়ের নাটশালা—আসিয়া পৌঁছেন।

এই নাটশালা হইতে শ্রীসনাতন ও কেশবছত্রীর পরামর্শে হুসেন শা'র ভয়ে পুনরায় তিনি পুরীতে ফিরিয়া যান। বৃন্দাবন যাওয়া হইল না। সেজন্য কিন্তু কোন আক্ষেপ মহাপ্রভুর মুখে শুনা যায় নাই। কারণ কী? অনুমান করি—যে জন্য তাঁহার গৌড়ে আসা, তা সফল হইয়াছিল। কাজেই বৃন্দাবন যাইতে না-পারায় তিনি বিশেষ দুঃখিত হন নাই। প্রভু শ্রীরূপ-সনাতনের জন্যই গৌড়ে আসিয়াছিলেন। এবং এই দুই রাজমন্ত্রী মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিয়া তাঁহার দলে আসিয়া ঈপ্সিত কার্য্যে যোগ দিবে—এই প্রতিশ্রুতি পাইয়া তিনি হৃষ্টমনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। আর ইহাও অনুমান করি যে—হুসেন শা' উদারনৈতিক ছিলেন সত্য, তথাপি মন্ত্রী শ্রীসনাতন ও কেশব খান যখন যাবনরাজভীতি-প্রযুক্ত গড়িদ্বার-পথে বৃন্দাবন যাইতে নিষেধ করিলেন, তখন প্রভু সতর্কতা অবলম্বন

করিয়া বুদ্ধিমানের কার্য্যই করিয়াছিলেন। চৈতন্যচরিত্রে দেবত্ব ও তদঙ্গীয় অলৌকিকত্ব পরে পরে আরোপিত হওয়ায় বুদ্ধি, বিদ্যা, চতুরতা, সম্প্রদায় গঠনে উপযুক্ত লোক সংগ্রহের ক্ষমতা—এই সমস্ত অসাধারণ মনুষ্যোচিত গুণাবলী ও প্রতিভা, যথাযথরূপে চিত্রিত হয় নাই।* তাহাতে চৈতন্যচরিত্র অলৌকিক ও কাল্পনিক হইয়া পড়িয়াছে। —সত্যি, চৈতন্যচরিত্র আবর্জ্জনায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে।

প্রভু রামকেলি আসিয়াছেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর বাঙলাদেশে প্রভুর এই প্রথম ও শেষ আগমন। লক্ষ লোকের সংঘট্ট। যে-পথ দিয়া তিনি আসিয়াছেন, সেই পথের ধূলি নিতে গিয়া লোকে মাটি গর্ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে। অত্যুক্তি বাদ দিয়া বুঝা যায় যে, প্রভুকে দেখিবার জন্য বাঙলাদেশ খুব একটা ইতিহাসে-স্মরণীয় ভীড় সেদিন করিয়াছিল। করিবার কথাই। উড়িষ্যা যে রাজোচিত আয়োজনে প্রভুকে বিদায় দিয়াছিল—তাহাতে বাঙলাদেশের এই ভক্তি ও কৌতূহল মিশ্রিত জনতা খুব স্বাভাবিক। বাঙলায় সেদিন হিন্দু রাজা থাকিলে হয়ত প্রতাপরুদ্রের মত আয়োজনেই প্রভুর সম্বর্দ্ধনা হইত। তবু, জনসাধারণ কিছু কম করে নাই।

মহাপ্রভুর রামকেলি আগমন

হুসেন শা'র দরবারে প্রভুর আগমনের কথা উঠিল। ইহা খুব স্বাভাবিক।

হুসেন শা' সম্বন্ধে চৈতন্যভাগবতে বৃন্দাবনদাস দুই রকম কথাই লিখিয়াছেন—

> যে হুসেন শাহা সর্ব্ব উড়িয়ার দেশে।
> দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষে॥

* Vaishnava Faith And Movement In Bengal—*Dr. S. K. Dey; pages 77—78.* ডাঃ দে'র অভিমত ঠেকসই নয়।

ওড্রদেশে কোটি কোটি প্রতিমা প্রাসাদ।
ভাঙ্গিলেক কত কত করিল প্রমাদ॥
—(চৈঃ ভাঃ—অন্ত্য, ৪র্থ অঃ)

Stewart-এর ইতিহাসে কেবল আছেঃ "The Tributory Rajas, as far as Orissa, paid implicit obedience to his (হুসেন শা'র) commands"—এই পর্য্যন্ত। প্রতিমা ভাঙ্গার কথা কিছু নাই। Vincent Smith ইহার উল্লেখও করেন নাই।

হুসেন শা', কেশব খান বা কেশব ছত্রীকে প্রথম মহাপ্রভুর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন।—

কহত কেশব খান কেমত তোমার।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলি, নাম বোলো যার॥
—(চৈঃ ভাঃ—অন্ত্য, ৪র্থ অঃ)

হুসেন শা' ও কেশব ছত্রী

চতুর্দ্দিক হইতে এত লোক তাঁহাকে দেখিতে আসে কেন? কেশব খান—পাছে গৌড়েশ্বর প্রভুর কোন অনিষ্ট করে, এই ভয়ে বলিলঃ 'কে বলে গোঁসাই'? এক ভিক্ষুক সন্ন্যাসী, নিতান্ত গরীব, গাছের তলায় থাকে, দুই-চারজন দেখিতে আসে—এইমাত্র।

কেশব ছত্রী গোপনে এক ব্রাহ্মণকে প্রভুর নিকট পাঠাইয়া দিল এবং বলিতে বলিল যে—তিনি যেন এই স্থান ত্যাগ করিয়া যান। যদিও প্রভুর প্রতি গৌড়েশ্বরের মনের ভাব এখন পর্য্যন্ত খুব ভাল, কিন্তু যদি কোন 'পাত্র' আসিয়া কুমন্ত্রণা দেয় এবং গৌড়েশ্বরের মন পরিবর্ত্তন হয়! সুতরাং—"রাজার নিকট গ্রামে কি কার্য্য রহিয়া?" —(চৈঃ ভাঃ—অন্ত্য, ৪র্থ অঃ)। যবনেরা ইতিমধ্যে গৌড়েশ্বরকে যে কুমন্ত্রণা দিতেছে, তার প্রমাণ কেশব ছত্রীর কথায় বুঝা যায়।—

যবনে তোমার ঠাঁই করয়ে লাগানি।
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, পৃঃ ৯৪)

প্রভু শুনিয়া বলিলেন—বেশ, রাজা ডাকে, যাব। তার জন্য ভয় কী?—

তোমরা ইহাতে কেন ভয় পাও মনে।
রাজা আমা চাহে মুঞি যাইমু আপনে॥
—(চৈঃ ভাঃ—অন্ত্য, ৪র্থ অঃ)

হুসেন শা' ও দবীর খাস্

গৌড়েশ্বর তারপর দবীর খাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন। চতুর দবীর খাস গৌড়েশ্বরের মনের ভাব বুঝিবার জন্য উত্তরে পাল্টা প্রশ্ন করিলেন—

তোমার চিত্তে চৈতন্যের কৈছে হয় জ্ঞান।
তোমার চিত্তে যেই লয় সেইত প্রমাণ॥
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, পৃঃ ৯৪)

কবিরাজ গোস্বামীর মতে—মহাপ্রভুকে হুসেন শা' সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া প্রকাশ করিলেন। বৃন্দাবনদাসও তাই লিখিয়াছেন।—

হিন্দু যারে বলে 'কৃষ্ণ', 'খোদায়' যবনে।
সেই তিঁহো নিশ্চয় জানিহ সর্ব্বজনে॥
—(চৈঃ ভাঃ—অন্ত্য, ৪র্থ অঃ)

ইহা অনেকটা অত্যুক্তি বলিয়াই মনে হয়। তবে এমন ঘোষণা হয়তো হুসেন শা' দিয়া থাকিতে পারেন।—

কাজী বা কোটাল বা তাঁহাকে কোন জনে।
কিছু বলিলেই তার লইমু জীবনে॥
—(চৈঃ ভাঃ—অন্ত্য, ৪র্থ অঃ)

রূপ-সনাতনের সহিত মহাপ্রভুর প্রথম-মিলন

এইবার শ্রীরূপ-সনাতন—দুই ভাই, স্বাধীন গৌড়ের দুই প্রধান-মন্ত্রী, দুপুররাত্রে বেশ লুকাইয়া প্রভুকে দেখিতে আসিলেন। গোপনে। গৌড়েশ্বর না জানিতে পারে—দুই মন্ত্রীর তাই

ঘরে আসি দুই ভাই যুকুতি করিয়া।
প্রভু দেখিবারে চলে বেশ লুকাইয়া॥
অর্দ্ধরাত্রে দুই ভাই এলা প্রভু স্থানে।
প্রথমে মিলিলা নিত্যানন্দ হরিদাস সনে॥
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ১ম পঃ)

লক্ষ্য করিবার বিষয়, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ও ঠাকুর হরিদাস মহাপ্রভুর সঙ্গেই ছিলেন।—

তারা দুইজন জানাইলা প্রভুর গোচরে।
রূপ, সাকর মল্লিক আইল তোমা দেখিবারে॥
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ১ম পঃ)

মন্ত্রীদ্বয় আসিয়া নিজেদের পরিচয় দিলেন।—

ম্লেচ্ছ জাতি, ম্লেচ্ছ সঙ্গী, করি ম্লেচ্ছ কর্ম্ম।
গো-ব্রাহ্মণদ্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম॥
* * *
জগাই মাধাই দুই করিলে উদ্ধার।
তাহা উদ্ধারিতে শ্রম নহিল তোমার॥

আমা উদ্ধারিয়া যদি রাখ নিজ বল।
পতিতপাবন নাম তবে ত সফল॥
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ১ম পঃ)

এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু বলিলেন-

শুনি মহাপ্রভু বলে শোন দবির খাস।
তুমি দুই ভাই মোর পুরাতন দাস॥
আজি হৈতে দুঁহা নাম রূপ সনাতন।
দৈন্য ছাড় তোমা দৈন্যে ফাটে মোর মন॥
দৈন্য পত্রী লিখি মোরে পাঠালে বার বার।
সেই পত্রী দ্বারে জানি তোমার ব্যাভার॥
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ১ম পঃ)

প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে—রাজমন্ত্রী শ্রীসনাতন নীলাচলে মহাপ্রভুকে গোপনে কতকগুলি (বার বার) পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ঐ পত্রে মহাপ্রভুর রামকেলি আসিবার কথা ছিল। ইহা ১৫১২-১৩ খৃষ্টাব্দের ঘটনা।

তারপরে, এইবার আসল কথা বলিলেন—

গৌড় নিকট আসিতে মোর নাহি প্রয়োজন।
তোমা দোঁহা মিলিবারে ইহ আগমন॥
এই মোর মন কথা কেহ নাহি জানে।
সবে বলে কেন এলে রামকেলি গ্রামে॥
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ১ম পঃ)

এখন বুঝা গেল, রামকেলিতে প্রভু আসিয়াছিলেন কেন।

এত বলি দোঁহা শিরে ধরি দুই হাতে।
দুই ভাই ধরি প্রভু পদ নিল মাথে॥
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ১ম পঃ)

সৈন্য ও রাজস্ব বিভাগের স্বাধীন বাঙলার দুই প্রধানমন্ত্রী কৌপীনমাত্র পরিধান এক উন্মাদ সন্ন্যাসীর পায়ে যখন মাথা লুটাইলেন—বৈষ্ণবধর্ম্মের আন্দোলন তখন ইতিহাসের আর এক নূতন পথে যাত্রা সুরু করিল।

অর্দ্ধরজনীর অন্ধকারকে আশ্রয় করিয়া যাঁহারা আসিয়াছিলেন—ফিরিবার পথে যে-আলোক লইয়া তাঁহারা ফিরিলেন, বাঙলার দীর্ঘ ৫টি শতাব্দী আজিও সেই আলোকে উজ্জ্বল—ভাস্বর—দ্যুতিমান।

যাইবার সময় শ্রীরূপ-সনাতন প্রভুকে বলিলেন—

ইহা হৈতে চল প্রভু ইহা নাহি কাজ।
যদ্যপি তোমারে প্রীতি করে গৌড়রাজ॥
তথাপি যবন জাতি, না করিহ প্রতীতি।
(আর) তীর্থযাত্রায় এত লোকের সংঘট্ট ভাল নহে রীতি॥

যার সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষ কোটি।
বৃন্দাবন যাবার এ নহে পরিপাটী॥
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ১ম পঃ)

প্রভু বৃন্দাবন গেলেন না। নীলাচলেই ফিরিয়া গেলেন।

এইবার একটু কর্কশ বাদানুবাদের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে।

সাকর মল্লিক এবং দবির খাস—এই দুই নাম আমরা চৈতন্য-ভাগবত এবং চৈতন্যচরিতামৃতে পাই। 'বিশ্বকোষে' শ্রীসনাতনের উপাধি 'সাকর মল্লিক' করা হইয়াছে। 'সপ্তগোস্বামী' গ্রন্থে 'সাকর-মল্লিক' শ্রীরূপের উপাধি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, এবং বিশ্বকোষের সিদ্ধান্ত ভুল ইহাও বলা হইয়াছে।

চৈতন্যভাগবতে আছে—

সাকর মল্লিক আর রূপ দুই ভাই।
—(চৈঃ ভাঃ—অন্ত্য, ১০ম পঃ)

কাজেই শ্রীরূপ—সাকর মল্লিক নন।

চৈতন্যভাগবতে আরও আছে—

সাকর মল্লিক নাম ঘুচাইয়া তান।
সনাতন অবধূত থুইলেন নাম।
—(চৈঃ ভাঃ—অন্ত্য, ১০ম পঃ)

এখানে স্পষ্ট বলা হইল যে—সাকর মল্লিক হইতেছে শ্রীসনাতন। কিন্তু দবির খাস যে শ্রীরূপ, ইহা চৈতন্যভাগবতে স্পষ্ট কোথায়ও নাই। যেখানে আছে "দবির খাসেরে প্রভু বলিতে লাগিলা"—সেখানে শ্রীরূপকে সম্বোধন করিতেছেন, এমন বুঝা যায় না। বরং বুঝায়, শ্রীসনাতনকেই সম্বোধন করিতেছেন। শ্রীসনাতনের সঙ্গেই প্রভুর কথাবার্তা হইয়াছে। শ্রীরূপ একা কোন উত্তর করেন নাই। গ্রন্থে নাই।

চৈতন্যচরিতামৃতে আছে (মধ্য লীলা)—"দবির খাসেরে রাজা পুছিল নিভৃতে।" হুসেন শা' এখানে শ্রীরূপকে সম্বোধন করিলেন, এমন বুঝায় না। বরং শ্রীসনাতনকে সম্বোধন করিলেন, এইরূপই বুঝায়। কেননা, সর্ব্বত্রই শ্রীরূপ অপেক্ষা শ্রীসনাতনের সহিতই মন্ত্রণাদি বেশী হইয়া থাকে—"রাজমন্ত্রী সনাতন বুদ্ধে বৃহস্পতি"।

চৈতন্যচরিতামৃতে আছে—"তবে দবির খাস এলা আপনার ঘরে"। কী প্রমাণ যে—ইহা শ্রীরূপকে বুঝায়, শ্রীসনাতনকে বুঝায় না। একটু পরেই আছে—

রূপ, সাকর মল্লিক আইলা তোমা দেখিবারে।
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ১ম পঃ)

শ্রীরূপই সাকর মল্লিক—ইহা সিদ্ধান্ত করিলে, চৈতন্যভাগবতের স্পষ্ট উক্তি অস্বীকার করা হয়। কিন্তু তার প্রয়োজন নাই। শ্রীরূপ, সাকর মল্লিক—দুইজন ধরিলেই হয়। চৈতন্যভাগবতে তা-ই আছে।—

শুনি মহাপ্রভু কহে শুন দবির খাস।

আজ হৈতে দুঁহা নাম রূপ সনাতন।
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ১ম পঃ)

এখানে 'দবির খাস' সম্বোধনে প্রভু শ্রীসনাতনকে সম্বোধন করিতেছেন—এমন প্রমাণাভাব। পণ্ডিত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন, 'সপ্তগোস্বামী' গ্রন্থের মত গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ দেখান নাই।*

* এই প্রসঙ্গে *Sarkar's* 'Shivaji And His Times'—p 464.
রাখাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গলার ইতিহাস'—২য় খণ্ড, ৯ম অঃ, পৃঃ ২৪৪।
রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তীর 'গৌড়ের ইতিহাস'—২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৪···দ্রষ্টব্য।

শ্রীসনাতনকেই সাকর মল্লিক ও দবির খাস, এই দুই নামে অভিহিত করা হইতেছে—শ্রীরূপ সর্ব্বত্রই রূপ নামে আখ্যাত হইতেছেন

আমার মনে হয়, সাকর মল্লিক ও দবির খাস—শ্রীসনাতনকেই এই দুই নামে অভিহিত করা হইয়াছে। শ্রীরূপের নাম সর্ব্বত্রই 'রূপ' বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়। চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতের প্রমাণের উপর আমার এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতেছি।

আর এক কথাঃ শ্রীরূপ-সনাতন জাতিতে কী ছিলেন? কর্ণাট দেশের রাজা বিপ্ররাজ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ কি-না আলোচ্য। হইলেও নিজেদের স্পষ্ট স্বীকারোক্তিতে তাঁহারা 'ম্লেচ্ছ জাতি', অর্থাৎ মুসলমান। বৈষ্ণব হইয়াও—গোস্বামী পদবী লাভের পরেও—তাঁহারা পুরীতে যবন হরিদাসের বাড়ীতেই থাকিতেন। এবং শ্রীরূপ, সনাতন ও যবন হরিদাস—এই তিনজনে কদাপি জগন্নাথদেবের মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করেন নাই। হিন্দুদের মধ্যে অতি বড় নীচ জাতিরও অন্ততপক্ষে জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশাধিকার আছে। হয়ত ম্লেচ্ছ ছোঁয়াচ্ তাঁহাদের সম্পর্কে শেষ পর্য্যন্ত টিকিয়া ছিল।

শ্রীরূপ গোস্বামীর সহিত মহাপ্রভুর দ্বিতীয় সাক্ষাৎ—প্রয়াগে। মহাপ্রভু পুরী গিয়া কিছুদিন থাকিলেন। পরে উড়িষ্যার ঝারিখণ্ড-পথে বৃন্দাবন গেলেন। মথুরা-বৃন্দাবন দেখিয়া পুরী ফিরিতেছেন (১৫১৫ খৃঃ)—এমন সময় শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার ভ্রাতা অনুপমকে সঙ্গে লইয়া গৌড় হইতে প্রয়াগে আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিলেন।

কিন্তু শ্রীরূপের গৌড় হইতে প্রয়াগে আসা সহজ ব্যাপার ছিল না।

গৌড় হইতে—

শ্রীরূপ গোসাঞি তবে নৌকাতে ভরিয়া।
আপনার ঘর আইলা বহু ধন লঞা॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দিল তার অর্দ্ধ ধনে।
এক চৌঠি ধন দিল কুটুম্ব ভরনে॥

গৌড়ে রাখিল মুদ্রা দশ হাজারে।
সনাতন ব্যয় করে রহে মুদি ঘরে॥
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ১৯শ পঃ)

শ্রীরূপ দুইজন লোক পাঠাইয়া নীলাদ্রি হইতে সংবাদ আনিলেন যে—প্রভু বনপথে বৃন্দাবন গমন করিয়াছেন।—

শুনিয়া শ্রীরূপ লিখিল সনাতন ঠাঞি।
বৃন্দাবন চলিলা শ্রীচৈতন্য গোসাঞি॥
আমি দুই ভাই চলিলাম তাঁহারে মিলিতে।
তুমি যৈছে তৈছে ছুটি আইস তাঁহা হৈতে॥
দশ সহস্র মুদ্রা তাঁহা আছে মুদি স্থানে।
তাহা দিয়া কর শীঘ্র আত্মবিমোচনে॥
যৈছে তৈছে ছুটি তুমি আইস বৃন্দাবন।
এত লিখি দুই ভাই করিলা গমন॥
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ১৯শ পঃ)

প্রভু প্রয়াগে বিন্দুমাধব দর্শন করিয়া পূর্ব্বপরিচিত এক দাক্ষিণাত্য বিপ্রের 'গৃহে আসি নিভৃতে বসিলা'।—

প্রয়াগে মহাপ্রভুর সহিত শ্রীরূপের দ্বিতীয়বার মিলন

বিপ্র গৃহে আসি প্রভু নিভৃতে বসিলা।
শ্রীরূপ বল্লভ দুঁহে আসিয়া মিলিলা॥
দুই গুচ্ছ তৃণ দুঁহে দশনে ধরিয়া।
প্রভু দেখি দূরে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা॥
নানা শ্লোক পড়ি উঠে-পড়ে বার বার
প্রভু দেখি প্রেমাবেশ হইল দুঁহার॥
শ্রীরূপ দেখি প্রভুর প্রসন্ন হৈল মন।
উঠ উঠ রূপ আইস বলিলা বচন॥

তবে মহাপ্রভু তারে নিকটে বসাইলা।
সনাতনের বার্ত্তা কহ তাহারে পুছিলা॥

রূপ কহেন তিঁহো বন্দী রাজ ঘরে।
তুমি যদি উদ্ধার তবে হইবে উদ্ধারে॥
প্রভু কহেন সনাতনের হইয়াছে মোচন।
অচিরাতে আমা সহ হইবে মিলন।

—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ১৯শ পঃ)

তারপর—

ত্রিবেণী উপর প্রভুর বাসা ঘর স্থান।
দুই ভাই বাসা কৈল প্রভু সন্নিধান॥

প্রয়াগে মহাপ্রভু এক দাক্ষিণাত্য বিপ্রের বাড়ীতে ছিলেন। শ্রীরূপ নিকটেই একটি পৃথক বাসায় অবস্থান করিলেন। মহাপ্রভু শ্রীরূপকে দশদিন যাবৎ শিক্ষা দিলেন। শক্তি সঞ্চারণ করিলেন। রসগ্রন্থ লিখিবার আদেশ দিয়া বৃন্দাবন পাঠাইলেন।

লোকভীড় ভয়ে প্রভু দশাশ্বমেধে যাঞা।
রূপ গোঁসাইকে শিক্ষা করান শক্তি সঞ্চারিয়া॥

—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ১৯শ পঃ)

ইতিপূর্ব্বে গোদাবরীতীরে ১৫১০ খৃষ্টাব্দে রায় রামানন্দের কাছে যে-সকল রসতত্ত্ব ও সিদ্ধান্তের কথা প্রভু শুনিয়াছিলেন, সেই সমস্ত কথাই শ্রীরূপকে বলিলেন।—

রামানন্দ পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিল।
রূপে কৃপা করি তাহা সব সঞ্চারিল॥

—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ১৯শ পঃ)

কবি কর্ণপুর তাঁর রচিত চৈতন্যচরিতামৃত কাব্য ও চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক—এই দুই সংস্কৃত গ্রন্থে শ্রীরূপের সহিত প্রভুর মিলন-প্রসঙ্গ লিখিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামী ইহা উল্লেখ করিয়াছেন।—

শিবানন্দ সেন পুত্র কবি কর্ণপুর।
রূপের মিলন গ্রন্থে লিখিয়াছেন প্রচুর॥

—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ১৯শ পঃ)

চৈতন্যচন্দ্রোদয়—নবম অঙ্ক, পঞ্চসপ্ততি শ্লোক—প্রতাপরুদ্রের প্রতি সার্ব্বভৌম বাক্য—

প্রিয় স্বরূপে দয়িত স্বরূপে।
প্রেম স্বরূপে সহজাতি রূপে॥
নিজানুরূপে প্রভুরেক রূপে।
ততান রূপে স্ববিলাস রূপে॥
এই মত কর্ণপুরে লিখে স্থানে স্থানে।
প্রভু কৃপা কৈল যৈছে রূপ সনাতনে॥
—(চৈঃ চঃ)

শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মের রসতত্ত্ব প্রভু নিজে শ্রীরূপ গোস্বামীকে এইবার বলিতে লাগিলেন—

প্রভু কহে শুন রূপ ভক্তি রসের লক্ষণ।
সূত্ররূপ কহি বিস্তার না যায় বর্ণন॥
পারাবারশূন্য গম্ভীর ভক্তিরসসিন্ধু।
তোমা চাখাইতে তার কহি একবিন্দু॥
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ১৯শ পঃ)

ভক্তিরস একটা শাস্ত্র। রসশাস্ত্র একটা বিজ্ঞান। শাণ্ডিল্য-সূত্রের 'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে'—ঈশ্বরে অনুরাগই ভক্তি—ইহা হইতেই প্রাচীনেরা এই শাস্ত্রকে একটা পৃথক বিজ্ঞানরূপে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। মনোবিজ্ঞান ইহার ভিত্তি। ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক রঘুমণি যেমন মিথিলার গৌতমীয় প্রাচীন ন্যায় ভাঙ্গিয়া বাঙ্গালীর নব্যন্যায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন—তেমনি শ্রীচৈতন্যদেব প্রাচীন রসশাস্ত্রের উপর বাঙালীর নূতন রসশাস্ত্র সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন ভক্তি শ্রীচৈতন্যদেব নিজের জীবনে ফুটাইয়া দেখাইয়াছেন—প্রেমে, ব্রজের ব্রজগোপীর পিরিতিরসে। এই রসসৃষ্টিই—ভগবানের সহিত জীবের যত প্রকার সম্বন্ধ, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ভক্তিপন্থী রামানুজ, মাধ্ব, নিম্বার্ক প্রভৃতি হইতে

এইখানে শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মের রসবিজ্ঞান বা রসশাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য। প্রভুই শ্রীরূপকে ইহা বলিয়াছেন। শ্রীরূপ গোস্বামী লক্ষ গ্রন্থে ইহা প্রথম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। অদ্যাপি শ্রীরূপের গ্রন্থই এ বিষয়ে আমাদের প্রধান অবলম্বন। শ্রীরূপ গোস্বামীকৃত ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণি যিনি পড়েন নাই, তিনি শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণবধর্ম্মের রসশাস্ত্র বুঝিবেন না। বক্তৃতা শুনিয়া দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি বুঝা যাইতে পারে। রসশাস্ত্র বুঝা যায় না। তবে দিগ্‌দর্শন হয়।

প্রভু শ্রীরূপকে বলিলেন—

শুদ্ধ ভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উৎপন্ন।

*　　*　　*

অন্য বাঞ্ছা, অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞান-কর্ম্ম। (*ক)
আনুকুল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয় কৃষ্ণানুশীলন। (*খ)
এই শুদ্ধ ভক্তি, ইহা হৈতে প্রেম হয়।
পঞ্চ-রাত্রে ভাগবতে এ লক্ষণ কয়। (*গ)

—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ১৯শ পঃ)

তারপর প্রভু বলিলেন—

ভুক্তি-মুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়॥

—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ১৯শ পঃ)

(*ক) অন্য বাঞ্ছা—অর্থ, ভগবানের সেবা ছাড়া নিজের সুখ বাঞ্ছা। জ্ঞান-কর্ম্ম—অর্থ, শঙ্করের জ্ঞানপথ ও কুমারিলের কর্ম্মপথ পরিত্যাগ।

(*খ) সর্ব্বেন্দ্রিয়ের কার্য্য ত্যাগ নহে, তাহাদিগকে কৃষ্ণ সেবায় নিয়োজিত করা।

(*গ) পঞ্চ-রাত্র—অর্থ, নারদপঞ্চরাত্র। ইহাতে শুদ্ধভক্তির কথা আছে। শুদ্ধভক্তি হইতে প্রেম হয়—ইহাই নূতন কথা।

কর্ম্মের ফল—ভোগ। জ্ঞানের ফল—মুক্তি। এ দুই বাঞ্ছা করিয়া সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন হয় না। প্রেম অহৈতুকী। নিষ্কাম।

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবৎ ভক্তি সুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়োভবেৎ॥
—(ভক্তিরসসিন্ধু—পূর্ব্ববিভাগ, ২য় লহরী, ১৬শ শ্লোক)

প্রভু বলিলেন—

সাধন-ভক্তি হৈতে রতির উদয়। (*ঘ)
রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম কয়॥ (*ঙ)
প্রেম বৃদ্ধি ক্রমে নাম স্নেহ মান প্রণয়। (*চ)
রাগ-অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়॥

* * *

এই সব কৃষ্ণ ভক্তি রস স্থায়ীভাব।
স্থায়ী ভাবে মিলে যদি বিভাব-অনুভাব॥ (*ছ)
স্বাত্ত্বিক-ব্যাভিচারী-ভাবের মিলনে।(*জ)
কৃষ্ণভক্তি রস হয় অমৃত আস্বাদনে॥
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ১৯শ পঃ)

শ্রীরূপ শুনিতেছেন, প্রভু বলিতেছেন।—

শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রস নাম।
কৃষ্ণভক্তি রস মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান॥

(*ঘ) সাধন-ভক্তি—দুই প্রকার: (১) রতি, (২) ভাব। ইন্দ্রিয় দ্বারা যে ভক্তি সাধিত হয়, তার নাম রতিভক্তি। ভাবরূপ ভক্তি দ্বারা যা সাধিত হয়, তার নাম সাধন-ভক্তি।

(*ঙ) শ্রীকৃষ্ণে মমতা আসে যে ভাব হইতে, তার নাম প্রেম।

(*চ) প্রেম গাঢ় হইয়া মন একেবারে দ্রবীভূত হইলে স্নেহ হয়।

(*ছ) বিভাব—উদ্দীপনা। অনুভাব—চিত্তের একাগ্রতা।

(*জ) স্বাত্ত্বিক-ব্যাভিচারী-ভাব—আট প্রকার: (১) স্তম্ভ (২) ঘর্ম্ম (৩) স্বরভেদ (৪) রোমাঞ্চ (৫) কম্প (৬) বর্ণবিকৃতি (৭) অশ্রু (৮) প্রলয়।

তারপর—

পুনঃ কৃষ্ণরতি হয় দুইত প্রকার।
ঐশ্বর্য্য জ্ঞান মিশ্রা, কেবলা ভেদ আর॥
গোকুলে কেবলা রতি ঐশ্বর্য্য জ্ঞানহীন।
পুরীদ্বয়ে বৈকুণ্ঠাদ্যে ঐশ্বর্য্য প্রবীণ॥

কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য বর্ণনা করিয়া প্রভু দেখাইলেন যে, শান্ত ও দাস্যে ঐশ্বর্য্যের বৃদ্ধি চলিতে পারে। কিন্তু বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর-এ ভগবানের ঐশ্বর্য্য সঙ্কুচিত হয়।—

শান্ত দাস্য রসে ঐশ্বর্য্য কাঁহাও উদ্দীপন।
বাৎসল্যে সখ্যে মধুর রসে সঙ্কোচন॥
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ১৯শ পঃ)

তারপর 'পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়', তাহাও বলিলেন।—

এইমত মধুরে সব ভাব সমাহার।
অতএব স্বাদাধিক্যে করে চমৎকার॥
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ১৯শ পঃ)

শ্রীরূপকে বৃন্দাবন যাইতে বলিয়া পুনরায় গৌড়দেশ দিয়া নীলাচলে আসিয়া সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন।—

বৃন্দাবন হৈতে তুমি গৌড় দেশ দিয়া।
আমারে মিলিবে নীলাচলেতে আসিয়া॥
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ১৯শ পঃ)

বৃন্দাবনে শ্রীরূপ গোস্বামী কিরূপে থাকিতেন?

অনিকেতন দুঁহে রহে যত বৃক্ষগণ।
একেক বৃক্ষ তলে একেক রাত্রি শয়ন॥

বিপ্র গৃহে স্থূল ভিক্ষা কাঁহা মাধুকরি।
শুষ্ক রুটি চানা চিবায় ভোগ পরিহরি॥
করোয়া মাত্র হাতে কাঁথা ছিঁড়া বহির্বাস।
কৃষ্ণ কথা কৃষ্ণ নাম নর্ত্তন উল্লাস॥
অষ্ট প্রহর কৃষ্ণভজন চারিদণ্ড শয়নে।
নামসংকীর্ত্তন প্রেমে নহে কোনদিনে॥
কভু ভক্তিরসশাস্ত্র করয়ে লিখন।
চৈতন্য কথা শুনে করে চৈতন্য চিন্তন।
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ১৯শ পঃ)

শ্রীরূপের বৃন্দাবনে অবস্থান

শ্রীরূপের সহিত এইবার প্রভুর তৃতীয়বার সাক্ষাৎ। বৃন্দাবন হইতে শ্রীরূপ কৃষ্ণলীলা নাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়া গৌড়দেশ দিয়া পুনরায় নীলাচল আসিলেন। "বৃন্দাবনে নাটকের আরম্ভ করিল। গৌড়ে আসিয়া অনুপমের গঙ্গা-প্রাপ্তি হইল॥"—(চৈঃ চঃ—অন্ত্য, ১ম পঃ)। গৌড় হইতে শ্রীরূপ একা নীলাচলে চলিলেন। পথে সত্যভামা স্বপ্ন দেখাইলেন যে, তাঁর নাটক যেন পৃথক করিয়া রচনা করা হয়—"আমার নাটক পৃথক করহ রচন।"—(চৈঃ চঃ—অন্ত্য, ১ম পঃ)। নীলাচল আসিয়া শ্রীরূপ দশমাস একাদিক্রমে বাস করিলেন। শ্রীরূপ, ঠাকুর হরিদাসের বাসস্থলে উপনীত হইলেন—"আসি উত্তরিলা হরিদাস বাসস্থলে"। সেইখানেই মহাপ্রভুর সহিত শ্রীরূপের প্রথম সাক্ষাৎ হইল। শ্রীরূপকে আলিঙ্গন করিয়া প্রভু শ্রীসনাতনের খবর জিজ্ঞাসা করিলেন।—

শ্রীরূপের নীলাচলে আগমন

সনাতনের বার্ত্তা যবে গোসাঞি পুছিল।
রূপ কহে তাঁর সঙ্গে দেখা না হইল॥
আমি গঙ্গা পথে আইলাম তিঁহো রাজপথে।
অতএব আমার দেখা না হৈল তাঁর সাথে॥

প্রয়াগে শুনিল তেঁহো গেল বৃন্দাবনে।
অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি কৈল নিবেদনে॥
রূপে তাঁহা বাসা দিয়া গোসাঞি চলিলা।

—(চৈঃ চঃ—অন্ত্য, ১ম পঃ)

রথযাত্রা উপলক্ষ্যে গৌড়ের ভক্তেরা আসিয়াছেন। আচার্য্য অদ্বৈত, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ—তাঁহারাও আসিয়াছেন। প্রভু বলিলেন—

অদ্বৈত নিত্যানন্দ তোমরা দুই জনে।
প্রভু কহে রূপে কৃপা কর কায়মনে॥

—(চৈঃ চঃ—অন্ত্য, ১ম পঃ)

—যাহাতে তোমাদের দুই জনের কৃপাতে শ্রীরূপ কৃষ্ণরসভক্তি-মূলক নাটক রচনা করিতে পারেন।

তারপর প্রভু বলিলেনঃ রূপ, আমার কৃষ্ণকে বৃন্দাবন-ছাড়া করিও না।—

কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে।
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যান কাঁহাতে॥

—(চৈঃ চঃ—অন্ত্য, ১ম পঃ)

সত্যভামার স্বপ্ন আর মহাপ্রভুর আদেশ—আশ্চর্য্য রকমে মিলিয়া গেল। এই কথার মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের একটা দার্শনিক ইঙ্গিত আমরা পাই। বৃন্দাবন এই সংসারক্ষেত্র। বৃন্দাবনের মিলন, সম্ভোগ ও বিরহ লইয়াই মানবজীবন। অতএব বৃন্দাবন সম্পূর্ণ। মথুরার, অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যের প্রয়োজন নাই।—ইহাই ষোড়শ শতাব্দীর বাঙালী বৈষ্ণবের নূতন কথা।

আর দিন মহাপ্রভু দেখি জগন্নাথ।
সার্ব্বভৌম রামানন্দ স্বরূপাদি সাথ॥
সবা মেলি চলি আইল শ্রীরূপে মিলিতে।
পথে তাঁর গুণ সবারে লাগিলা কহিতে॥

—(চৈঃ চঃ—অন্ত্য, ১ম পঃ)

রায় রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর, ঠাকুর হরিদাস, সার্ব্বভৌম—এই সকলকে লইয়া পরামর্শ করিয়া প্রভু শ্রীরূপকে দিয়া কৃষ্ণলীলা নাটক রচনা করাইতে লাগিলেন (বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব—দুই নাটক)।—

বিদগ্ধমাধব ও ললিত-মাধব নাটক

বিদগ্ধমাধব আর ললিতমাধব।
দুই নাটকে প্রেমরস অদ্ভুত সব॥
—(চৈঃ চঃ—অন্ত্য, ১ম পঃ)

প্রভু গোদাবরীতীরে (১৫১০ খৃঃ) রায় রামানন্দের নিকট যে কৃষ্ণরাধার যুগল-রসতত্ত্ব শুনিয়াছিলেন, প্রয়াগে (১৫১৫ খৃঃ) শ্রীরূপকে শক্তি সঞ্চার করিয়া তাহাই বলিয়াছিলেন। এক্ষণে নীলাচলে রায় রামানন্দ স্বয়ং উপস্থিত। সুতরাং প্রভু রায়ের সহিত শ্রীরূপের রায়-কথিত রসতত্ত্ব সাক্ষাৎ-আলোচনার সুযোগ দিলেন। রায়ের সহিত শ্রীরূপের কথাবার্ত্তা চলিল।—

রায় কহে কহ দেখি প্রেমোৎপত্তি কারণ।
পূর্ব্বানুরাগ বিকার চেষ্টা কাম লিখন॥
ক্রমে শ্রীরূপ গোসাঞি সকলি কহিল।
শুনি প্রভুর ভক্তগণে চমৎকার হৈল॥

* * *

রায় কহে কহ দেখি ভাবের স্বভাব।
রূপ কহে ঐছে হয় কৃষ্ণবিষয় ভাব॥
রায় কহে সহজ কহ প্রেমের লক্ষণ।
রূপ গোসাঞি কহে সাহজিক প্রেম ধর্ম্ম।
—(চৈঃ চঃ—অন্ত্য, ১ম পঃ)

রায়ের উপদেশে 'সহজ' কথাটা আসিয়াই পড়ে।

রায় কহে তোমার কবিত্ব অমৃতের ধার।
দ্বিতীয় নাটকের কহ নান্দী ব্যবহার॥

রূপ কহে কাঁহা তুমি সূর্য্যোপম ভাস।
মুঞি কোন্ ক্ষুদ্র যেন খদ্যোত প্রকাশ॥
—(চৈঃ চঃ—অন্ত্য, ১ম পঃ)

রায়ের রসসিদ্ধান্তই শ্রীরূপ গ্রহণ করিলেন। কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্যচরিতামৃতে ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ করিয়া দিতেছেন।—

একদিন রূপ করেন নাটক লিখন।
আচম্বিতে মহাপ্রভুর হৈল আগমন॥
সম্ভ্রমেতে দুঁহে উঠি দণ্ডবৎ হৈলা।
দুঁহে আলিঙ্গিয়া প্রভু আসনে বসিলা॥
কাঁহা পুঁথি লিখ বলি একপত্র নিল।
অক্ষর দেখিয়া প্রভু মনে সুখী হৈল॥
শ্রীরূপের অক্ষর যেন মুকুতার পাঁতি।
প্রীত হঞা করে প্রভু অক্ষরের স্তুতি॥
—(চৈঃ চঃ—অন্ত্য, ১ম পঃ)

শ্রীরূপ তাঁহার রচিত নাটকে মহাপ্রভুর অবতারত্ব লিপিবদ্ধ করিলেন। মহাপ্রভুকে তাহা শুনাইলেন।—

সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ।
—(বিদগ্ধমাধব—প্রথমাঙ্ক, দ্বিতীয় শ্লোক)

প্রভু কহিলেন—

কাঁহা তোমার কৃষ্ণরস কাব্যসুধাসিন্ধু।
তার মধ্যে মিথ্যা কেনে স্তুতি ক্ষার বিন্দু॥
রায় কহে রূপের কাব্য অমৃতের পূর।
তার মধ্যে এক বিন্দু দিয়াছে কর্পূর॥
প্রভু কহে রায় তোমার ইহাতেও উল্লাস।
শুনিতেও লজ্জা লোকে করে উপহাস॥
—(চৈঃ চঃ—অন্ত্য, ১ম পঃ)

কোন আন্দোলনই তার সাহিত্য ব্যতিরেকে ইতিহাসে বাঁচিতে

পারে না। শ্রীচৈতন্যদেব অতি আশ্চর্য্য রকমে এই সত্য পাঁচ শতাব্দী পূর্ব্বে অনুভব করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব-রসশাস্ত্র রচনায় মহাপ্রভুর প্রেরণা, তাঁহার সংগঠন-শক্তির আর এক অদ্ভুত পরিচয়। শ্রীরূপ, মহাপ্রভুর সৃষ্টি।

শ্রীরূপের সহিত রামকেলিতে প্রভুর যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন হুসেন শা'র রাজস্ব বিভাগের এই মন্ত্রীটির বয়স ২৫ বৎসর মাত্র। প্রভু অপ্রকট হইবার পরেও (১৫৩৩।২৯শে জুন) ত্রিশ বৎসর শ্রীরূপ গোস্বামী বৃন্দাবনে জীবিত ছিলেন। শুধু জীবিত ছিলেন না—গ্রন্থ লিখিয়াছেন।*

এইবার শ্রীরূপকে গৌড় দেশ দিয়া প্রভু পুনরায় বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন।—

বৃন্দাবনে যাহ তুমি রহিও বৃন্দাবনে।
একবার ইহা পাঠাইহ সনাতনে॥
ব্রজে যায়া রসশাস্ত্র কর নিরূপণ।
লুপ্ততীর্থ সব তার করিহ প্রচারণ॥
কৃষ্ণসেবা রসভক্তি করিও প্রচার।
আমিহ দেখিতে তাঁহা যাব একবার॥
এত বলি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
রূপ গোঁসাঞি শিরে ধরে প্রভুর চরণ॥
প্রভুর ভক্তগণ পাশে বিদায় লইলা।
পুনরপি গৌড়পথে বৃন্দাবনে আইলা॥

—(চৈঃ চঃ—অন্ত্য, ১ম পঃ)

* শ্রীরূপ গোস্বামী যে-সকল গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহা এই—(১) হংসদূত (২) উদ্ধবসন্দেশ (৩) কৃষ্ণজন্মতিথি (৪) গণোদ্দেশদীপিকা (৫) স্তবমালা (৬) বিদগ্ধমাধব (৭) ললিতমাধব (৮) দানকেলিকৌমুদী (৯) আনন্দ-মহোদধি (১০) ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১১) উজ্জ্বলনীলমণি (১২) প্রযুক্ত্যাখ্যাত-চন্দ্রিকা (১৩) মথুরামহিমা (১৪) পদ্যাবলী (১৫) নাটকচন্দ্রিকা (১৬) লঘু-ভাগবতামৃত (১৭) গোবিন্দবিরুদাবলী···ইত্যাদি আরও গ্রন্থ।

শ্রীসনাতন গোস্বামী

[জন্ম—১৪৮৮ খৃঃ ॥ মৃত্যু—১৫৫৮ খৃঃ ॥ ৭১ বৎসর]

॥ শ্রীসনাতন গোস্বামী ॥

"প্রভু কহে তোমা স্পর্শি আত্ম পবিত্রিতে।
ভক্তিবলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে।
* * *
আমার উপদেষ্টা তুমি প্রাণাধিক আর্য্য।"

গৌড়ে হুসেন শাহের রাজত্বের (১৪৯৩—১৫১৯ খৃঃ) পটভূমিকার উপর শ্রীসনাতন গোস্বামীকে আমরা প্রথম দেখিতে পাই রাজমন্ত্রীরূপে। "রাজমন্ত্রী সনাতন বুদ্ধে বৃহস্পতি।"

তারপর শেষ তাঁহাকে দেখিতে পাইব বৃন্দাবনে। শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচারক—বৈরাগী, সন্ন্যাসী রূপে।

হুসেন শাহের সাতাশ বৎসরব্যাপী দীর্ঘ রাজত্বকাল বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় পরিপূর্ণ। তাহার বিস্তৃত বিবরণ আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচনার বহির্ভূত। অথচ সংক্ষেপে কিছুটা না-বলিলেও সঙ্গত হইবে না।

হুসেন শাহের জন্মভূমি আরব দেশ। বাল্যকালেই তিনি তাঁহার পিতার সহিত গৌড়ে আসেন। দরিদ্র অবস্থায় তিনি এক ব্রাহ্মণের রাখালী করিতেন, অর্থাৎ গরু চড়াইতেন। তারপর সুবুদ্ধি রায়ের অধীনে যখন কাজ করেন, তখন তাঁহাকে পৃষ্ঠদেশে চাবুক পর্যন্ত খাইতে হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমে তিনি গৌড়ে সামসুদ্দিন মজাফ্ফরের (১৪৯১—১৪৯৩ খৃঃ) অধীনে চাকুরি গ্রহণ করিয়া তাঁহার মন্ত্রী হইয়াছিলেন। মন্ত্রী হওয়ার পর মজাফ্ফরকে হত্যা করিয়া (পর্তুগীজ ঐতিহাসিকদের মতে) তিনি গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন। এবং সমৃদ্ধশালী গৌড় নগরীকে লুণ্ঠন করিবার আজ্ঞা দেন। হিন্দু নগরবাসিরাই অধিকতর সমৃদ্ধশালী ছিল। তাহারা সোনার থালায় ভাত খাইত। এই সমস্ত সম্ভ্রান্ত হিন্দুদের বাড়ীঘর ধনসম্পত্তি সমস্তই বেমালুম লুণ্ঠিত হইল। পরে, লুণ্ঠন যখন মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়া অতিরিক্ত হইল, তখন বারো হাজার লুণ্ঠনকারিকে তিনি হত্যা

করিবার হুকুম দিলেন, এবং হত্যা করিলেনও। এবং লুণ্ঠিত দ্রব্য সরকারে বাজেয়াপ্ত করিলেন। তাঁহার রাজত্বে বহু যুদ্ধবিগ্রহের খবর আমরা পাই। সিকান্দার লোদীর আক্রমণ হইতে বাংলার স্বাধীনতা তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন, এবং পাটনার নিকটবর্ত্তী বাঙ্গলার সীমা বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। তিনি কামরূপ (আসাম) জয় করিয়াছিলেন। ত্রিপুরা রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। আর উড়িষ্যার তো কথাই নাই। রাজা প্রতাপরুদ্রের সহিত বহুবার তাঁহার যুদ্ধ চলিয়াছিল। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে উড়িষ্যার সহিত যুদ্ধগুলি আমাদের দৃষ্টি সমধিক আকর্ষণ করে।

বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

হুসেন শাহ

যে হুসেন শাহ সর্ব্ব উড়িয়ার দেশে।
দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষে॥
ওড্রদেশে কোটি কোটি প্রতিমা প্রাসাদ।
ভাঙ্গিলেক কত কত করিল প্রমাদ॥

—(চৈঃ ভাঃ—অন্ত্য, ৪র্থ অঃ)

যে-সকল ঐতিহাসিক হুসেন শাহকে আকবরের সহিত তুলনা করিয়াছেন, তাঁহারা এক্ষেত্রে আওরঙ্গজীবের সহিতও হুসেন শাহকে তুলনা করিলে অন্যায় করিতেন না।

হুসেন শাহের রাজত্বকালে আমরা দুইটি জিনিস লক্ষ্য করি। ১ম, শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অভ্যুত্থান। ২য়, হুসেন শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্যের বিকাশ।

বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে হুসেন শাহ যাহা করিয়াছেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয়। ইহা ছাড়া, তিনি লোকহিতকর কার্য্যও—হাসপাতাল, কলেজ প্রভৃতি—প্রত্যেক জেলায় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।*

শ্রীসনাতন গোস্বামী কে? এবং কবে তিনি হুসেন শাহের মন্ত্রিত্ব

---

* "He built public mosques and hospitals in every District, and settled pensions on the learned and devout,…

গ্রহণ করিয়াছিলেন ? কথিত আছে, তিনি কর্ণাটী ব্রাহ্মণ। কর্ণাটের রাজবংশসম্ভূত। যে কারণেই হউক, তাঁহারা কয়েক পুরুষ যাবৎ গৌড়ে আসিয়া বসবাস করিতে ছিলেন। এবং একরূপ বাঙ্গালীই হইয়া গিয়াছিলেন। শ্রীসনাতনের বাল্যজীবন আমরা কিছুই জানি না।

শ্রীসনাতন গোস্বামী কে

কথিত আছে, তিনি এবং তাঁহার ভ্রাতা শ্রীরূপ নবদ্বীপের টোলে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পরে, কোন্ সূত্রে যে তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা শ্রীরূপ হুসেন শাহের দরবারে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রাজার মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলেন, তাহা সঠিকরূপে নিরূপণ করা কঠিন। ইতিহাসে অথবা বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে ইহার কোনই স্পষ্ট উল্লেখ নাই। এক অনুমানের উপর ভরসা।

হুসেন শাহের রাজত্বে প্রথমেই দেখিতে পাই—তিনি রাজপ্রাসাদের বিশ্বাসঘাতক রক্ষী হাবসী (Abyssinian) সৈন্যদের বরখাস্ত করিলেন। তাহারা ফতে শাহকে (১৪৮৩—১৪৯১ খৃঃ) প্রাসাদমধ্যেই হত্যা করিয়াছিল। এবিসিনিয়ান্দের ঝাড়েবংশে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন। এবং অভিজাত বংশীয় সম্ভ্রান্ত মুসলমান ও হিন্দুদিগকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। এই সময়েই, অনুমান হয়, শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ হুসেন শাহ কর্ত্তৃক মন্ত্রিত্ব গ্রহণে আমন্ত্রিত হন। এবং তাঁহারা উহা গ্রহণ করেন। সনাতনকে 'দবীর খাস্' উপাধি দেওয়া হয়। দবীর-খাস্ অর্থ, বিশ্বস্ত খাস্ মুন্সি (প্রাইভেট সেক্রেটারী)। পরে তিনি প্রধানমন্ত্রী হইয়াছিলেন। শুধু রূপ-সনাতন নহেন, আরও অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দুকে হুসেন শাহ রাজকার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

হুসেন শাহের হিন্দু-কর্ম্মচারিগণ

পুরন্দর খানকে উজিরী দিয়াছিলেন। তাঁহার নাম গোপীনাথ বসু। তাঁহার প্রধান চিকিৎসক—মুকুন্দদাস। তাঁহার

he settled a grant of lands for the support of the tomb, college and hospital…."—History Of Bengal; *Stewart*, p. 129.

দেহরক্ষীদের প্রধান—কেশব ছত্রী। টাঁকশালের অধ্যক্ষ—অনুপ। দ্বিতীয় ত্রিপুরা যুদ্ধে গৌড় মল্লিক প্রধান সেনাপতিপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।—ইঁহারা সকলেই হিন্দু ছিলেন। এই ক্ষেত্রে সম্রাট আকবরের সহিত হুসেন শাহকে নিঃসন্দেহে তুলনা করা যাইতে পারে।*

সনাতন গোস্বামীর সহিত মহাপ্রভুর তিনবার সাক্ষাতের কথা আমরা পাই।

১ম—গৌড়ের নিকট রামকেলি গ্রামে। ২য়—কাশীতীর্থে। ৩য়—নীলাচলে।

সন্ন্যাসের (১৫১০ খৃঃ) পর 'পঞ্চম বর্ষে' মহাপ্রভু রামকেলি আসিলেন। ইহা ১৫১৪ খৃঃ, ডিসেম্বর মাসে হইতে পারে। বাহিরে

* "One of the first acts of Ala Adeen's Government was to reduce the corps of Paiks, who had so frequently assisted in dethroning their sovereigns······He also dismissed the whole of the Abyssinian troops."—*History Of Bengal*, Stewart, *page 127*.

"In appointing Hindus to high offices······to put them in charge of highly confidential work was certainly something more than mere diplomatic expediency. His wazir (Gopinath Basu, entitled Purandar Khan), his private physician (Mukunda Das), his chief of the body-guards (Kesava Chhatri), Master of the mint (Anup)—were all Hindus; the Rajmala adds the name Gaur Mallik, his General in charge of the Second Tipperah Expedition. The name of the two brothers Rup and Sanatan, one of whom held the highly important office of the Private Secretary (Dabir-i-Khas) are well known."—*History Of Bengal, Vol. II, p. 153.*, edited by Sir Jadunath Sarkar.

প্রকাশ, 'জননী ও জাহ্নবী' দর্শন করিয়া মহাপ্রভু বৃন্দাবনে যাইবেন। কিন্তু বাহিরে প্রকাশ নয়—এমন একটা গোপন উদ্দেশ্য ইহার মধ্যে লুকায়িত আছে। রামকেলি আসিবার জন্য সনাতন গোস্বামী ১৫১৩ খৃঃ নীলাচলে মহাপ্রভুকে কতকগুলি চিঠি লিখিয়াছিলেন। শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপকে উদ্ধার করিবার জন্য ঐ চিঠিগুলিতে, অনুমান হয়, অনুরোধ ছিল। প্রভু সেই অনুরোধ রক্ষা করিবার জন্যই রামকেলি আসিয়াছেন। কেননা, যবনরাজভীতি-প্রযুক্ত হুসেন শাহের মন্ত্রিত্ব ছাড়িয়া রূপ-সনাতনের পক্ষে নীলাচল যাওয়া সম্ভব ছিল না। বিশেষতঃ সেই বৎসরে প্রতাপরুদ্রের সহিত হুসেন শাহের পুনরায় যুদ্ধ করিবার প্রস্তুতি চলিতেছিল।

নীলাচলে মহাপ্রভুকে সনাতন গোস্বামী কতকগুলি চিঠি দিয়াছিলেন

সনাতন শুধু রাজমন্ত্রী নন, দবীর খাস্—হুসেন শাহের প্রাইভেট সেক্রেটারী। বুদ্ধিতে বৃহস্পতি। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। গৌড়রাজ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ব্যক্তি (চীফ্ মিনিষ্টার)। তাঁহার আবার উদ্ধারের কী প্রয়োজন? কিসের উদ্ধার তিনি চান? এ প্রশ্ন আমাদের মনে উদয় হওয়া খুব স্বাভাবিক। মন্ত্রী হওয়ার পর রূপ-সনাতন আর কর্ণাটী ব্রাহ্মণ নহেন। যে কারণেই হউক, হিন্দু সমাজ তাঁহাদিগকে বর্জ্জন (বয়কট) করিয়াছে। রূপ-সনাতন মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই সত্য, কিন্তু তাঁহারা 'ম্লেচ্ছ জাতি' বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতে বাধ্য হইয়াছেন। অথচ, এই ম্লেচ্ছজাতির অন্তর্ভুক্ত থাকিতে তাঁহারা অনিচ্ছুক। 'গোব্রাহ্মণদ্রোহী সঙ্গে' দিবারাত্রি থাকিয়া মন্ত্রিত্ব করিতেও তাঁহাদের বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। হিন্দু সমাজ তাঁহাদের আর পুনরায় গ্রহণ করিবে না। মহাপ্রভুর বৈষ্ণব সমাজ তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে পারে। তাঁহাদের এই উপায়ে ম্লেচ্ছজাতিত্ব হইতে উদ্ধার পাইবার বাসনা হইয়াছিল। মহাপ্রভুর বৈষ্ণব ধর্ম্মে তখন মুসলমানের প্রবেশ-অধিকার ছিল। যবন হরিদাসকে দিয়া তিনি নামের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন। মথুরা-বৃন্দাবন যাইবার পথে তিনি পাঠানদের বৈষ্ণব করিয়াছিলেন।—

"সেই তো পাঠান সব বৈরাগী হইলা।
পাঠান বৈষ্ণব বলি হইলা তাঁর খ্যাতি ॥"

যবন হরিদাসকে মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—

"এই মোর দেহ হইতে তুমি মোর বড়।
তোমার যে জাতি সেই জাতি মোর দড় ॥"

বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

"বৈষ্ণবের জাতি বুদ্ধি যে করে।
কোটি কোটি জন্ম অধম যোনিতে ডুবি সে মরে ॥"

ব্রাহ্মণ-পরিচালিত হিন্দুসমাজ ও মহাপ্রভুর পরিচালিত বৈষ্ণব-সমাজ—এই উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ পৃথক। অতএব, সনাতন গোস্বামী ম্লেচ্ছজাতিত্ব হইতে মহাপ্রভুর এই বৈষ্ণব-সমাজে প্রবেশাধিকার চাহিয়াছিলেন। ইহারই নাম উদ্ধার।

মহাপ্রভু রামকেলি আসিয়া উপনীত হইলেন। সঙ্গে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ও যবন হরিদাস আছেন। সন্ন্যাসের পর বাংলাদেশে মহাপ্রভুর এই প্রথম ও শেষ আগমন। হুসেন শাহের দীর্ঘ সাতাইশ বৎসর রাজত্বকাল শেষ হইবার আর মাত্র পাঁচ বৎসর বাকি।

হুসেন শাহ ও কেশব ছত্রী

প্রভু যে-পথে আসিলেন সেই পথে তাঁহাকে দেখিবার জন্য কৌতুহলী জনতা অভাবনীয় রকমের ভীড় করিয়াছিল। বৈষ্ণবগ্রন্থে এইরূপ আছে যে—লোক তাঁহার চরণচিহ্নিত পথের ধূলি নিবার জন্য মাটি গর্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। দুই পাশের বৃক্ষ মাথা নোয়াইয়া প্রভুকে প্রণাম করিয়াছিল। এইসব অতিরঞ্জিত কথা হুসেন শাহের কর্ণগোচর হইতে বিলম্ব হইল না। তিনি কেশব ছত্রীকে ডাকিয়া স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিলেন—

কহত কেশব খান কেমত তোমার।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বলি নাম বোলো যাঁর ॥

—(চৈঃ চঃ—অন্ত্য, ৪র্থ অঃ)

চতুর্দ্দিক হইতে এত লোক তাঁহাকে দেখিতে আসে কেন? কেশব খান, পাছে গৌড়েশ্বর প্রভুর কোনো অনিষ্ট করে, এই ভয়ে বলিল: 'কে বলে গোসাঞি'? এক ভিক্ষুক সন্ন্যাসী, নিতান্ত গরীব, গাছের তলায় থাকে, দুই-চারিজন দেখিতে আসে মাত্র।

কেশব ছত্রী গোপনে এক ব্রাহ্মণকে প্রভুর নিকট পাঠাইয়া দিল এবং বলিতে বলিল যে—তিনি যেন সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া যান। যদিও গৌড়েশ্বরের মনের ভাব প্রভুর উপর এপর্য্যন্ত ভাল, কিন্তু যদি কোন পাত্র আসিয়া কুমন্ত্রণা দেয় এবং গৌড়েশ্বরের মন-পরিবর্ত্তন হয়, সুতরাং "রাজার নিকট গ্রামে কী কার্য্য রহিয়া।"

যবনেরা ইতিমধ্যে গৌড়েশ্বরকে কুমন্ত্রণা দিতেছে, তার প্রমাণ কেশব ছত্রীর কথায় বুঝা যায়—"যবনে তোমার ঠাঁই করয়ে লাগানি"।—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ৯ম অঃ)।

হুসেন শাহ ও দবীর খাস্

গৌড়েশ্বর তারপর দবীর খাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন। চতুর দবীর খাস্ গৌড়েশ্বরের মনের ভাব বুঝিবার জন্য উত্তরে পাল্টা প্রশ্ন করিলেন—

তোমার চিত্তে চৈতন্যের কৈছে হয় জ্ঞান।
তোমার চিত্তে যেই লয় সেইতো প্রমাণ॥
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ১ম পঃ)

কবিরাজ গোস্বামীর মতে—মহাপ্রভুকে হুসেন শাহ 'সাক্ষাৎ ঈশ্বর' বলিয়া প্রকাশ করিলেন। বৃন্দাবনদাসও তাহাই লিখিয়াছেন।—

হিন্দু যারে বলে কৃষ্ণ খোদায় যবনে।
সেই তিঁহ নিশ্চয় জানিহ সর্ব্বজনে॥
—(চৈঃ ভাঃ—অন্ত্য, ৪র্থ অঃ)

ইহা অনেকটা অত্যুক্তি বলিয়াই মনে হয়। তবে এমন একটা ঘোষণা হয়ত হুসেন শাহ দিয়া থাকিবেন—

কাজি বা কোটাল বা তাঁহাকে কোন জনে।
কিছু বলিলেই তার লইমু জীবনে॥
—(চৈঃ ভাঃ—অন্ত্য, ৪র্থ অঃ)

জয়ানন্দ আরও পরিষ্কার করিয়া লিখিয়াছেন যে, দুই পার্শ্বের বৃক্ষসকল প্রভুকে মাথা নোয়াইয়া প্রণাম করে—হুসেন শাহ এই কথা শুনিয়া কেশব খানকে বলিলেন যে : "কেমন কৃষ্ণ চৈতন্য গাছে নোয়ায় মাথা" ; তাহাকে আমার নিকট ধরিয়া আন।

এই কথা শুনিয়া, প্রভু রামকেলি হইতে শান্তিপুর চলিয়া গেলেন—

রূপ দেখিয়া কুলবধূ চুল নাঞি বান্ধে।
গাছে মাথা নোঞাএ গোঁসাঞি তার নাটে॥
* * *
রাজা বলে কেশব খাঁ ধরিয়া আন এথা।
তাহা শুনি নিবর্ত্ত হইলা চৈতন্য ঠাকুর।
সর্ব্ব পার্ষদ সঙ্গে গেলা শান্তিপুর॥
—(জয়ানন্দ, চৈঃ মঃ—বিজয় খণ্ড)

হুসেন শাহ মহাপ্রভুকে ধরিয়া আনিবার হুকুম দিয়াছিলেন

জয়ানন্দ স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে, হুসেন শাহ প্রভুকে ধরিয়া আনিবার হুকুমই কেশব খানকে দিয়াছিলেন। কেশব খান সৈনিকপুরুষ। হুসেন শাহের দেহরক্ষিদের প্রধান।

এইবার রূপ-সনাতন দুই ভাই—স্বাধীন গৌড়ের দুই প্রধান মন্ত্রী—দুপুর রাত্রে বেশ লুকাইয়া প্রভুকে দেখিতে আসিলেন। গোপনে। গৌড়েশ্বর না-জানিতে পারেন, দুই মন্ত্রীর তাই অভিপ্রায়।—

ঘরে আসি দুই ভাই যুকুতি করিয়া
প্রভু দেখিবারে চলে বেশ লুকাইয়া॥

অর্দ্ধরাত্রে দুই ভাই এলা প্রভু স্থানে।
প্রথমে মিলিল নিত্যানন্দ হরিদাস সনে॥
তারা দুইজনে জানাইল প্রভুর গোচরে।
রূপ, সাকর মল্লিক আইলা তোমা দেখিবারে॥
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ১ম পঃ)

মন্ত্রীদ্বয় আসিয়া নিজেদের পরিচয় দিলেন—

ম্লেচ্ছ জাতি, ম্লেচ্ছ সঙ্গী, করি ম্লেচ্ছ কর্ম্ম।
গোব্রাহ্মণদ্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম॥

রূপ-সনাতনের সহিত মহাপ্রভুর মিলন

*　*　*

জগাই-মাধাই দুই করিলে উদ্ধার।
তাহা উদ্ধারিতে শ্রম না ছিল তোমার॥

*　*　*

আমা উদ্ধারিয়া যদি রাখ নিজ বল।
পতিতপাবন নাম তবে তো সফল॥

এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু বলিলেন—

শুনি মহাপ্রভু কহে শুন দবির খাস।
তোমা দুই ভাই মোর পুরাতন দাস॥
আজি হৈতে দোঁহা নাম রূপ সনাতন।
দৈন্য ছাড়, তোমা দৈন্যে ফাটে মোর মন॥
দৈন্য পত্রী লিখি মোরে পাঠালে বার বার।
সেই পত্রী দ্বারা জানি তোমার ব্যাভার॥

তারপর, এইবার আসল কথা বলিলেন—

গৌড় নিকট আসিতে মোর নাহি প্রয়োজন।
তোমা দোঁহে মিলিবারে ইহ আগমন॥
এই মোর মন কথা কেহ নাহি জানে।
সবে বলে কেনে এল রামকেলি গ্রামে॥

এখন বুঝা গেল রামকেলিতে প্রভু আসিয়াছিলেন কেন।

এত বলি দোঁহা শিরে ধরি দুই হাতে।
দুই ভাই ধরি প্রভুপদ নিল মাথে॥
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ১ম পঃ)

স্বাধীন বাংলার সৈন্য ও রাজস্ব বিভাগের দুই প্রধান মন্ত্রী—কৌপীনমাত্র পরিধান, এক উন্মাদ সন্ন্যাসীর পায়ে যখন মাথা লুটাইল, বৈষ্ণব-ধর্ম্মের আন্দোলন তখন ইতিহাসের আর এক নূতন পথে যাত্রা সুরু করিল। অর্দ্ধরজনীর অন্ধকারকে আশ্রয় করিয়া যাঁহারা আসিয়াছিলেন, ফিরিবার পথে যে-আলোক লইয়া তাঁহারা ফিরিলেন—বাঙলার দীর্ঘ পাঁচটি শতাব্দী আজিও সেই আলোকে উজ্জ্বল, ভাস্বর, দ্যুতিমান রহিয়াছে।

যাইবার সময় রূপ-সনাতন প্রভুকে বলিলেন—

ইহা হইতে চল প্রভু ইহা নাহি কাজ।
যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ॥
তথাপি যবন জাতি না করিহ প্রতীতি।
(আর) তীর্থযাত্রায় এত লোকের সংঘট্ট ভাল নহে রীতি॥
যাঁহার সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষ কোটি।
বৃন্দাবন যাবার এ নহে পরিপাটি॥
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ১ম পঃ)

প্রভু বৃন্দাবন গেলেন না। নীলাচলেই ফিরিয়া গেলেন। ১৫১৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস মধ্যে প্রভু নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

রামকেলি হইতে মহাপ্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন

চাঁদকাজীর বাড়ী লুণ্ঠনের (১৫১০ খৃঃ) অব্যবহিত পরেই মহাপ্রভু কাটোয়ায় সন্ন্যাস লইয়া নীলাচল চলিয়া যান।

হুসেন শাহের আঠারোটি পুত্রকন্যা ছিল। চাঁদকাজী, হুসেন

শাহের একজন দৌহিত্র। চাঁদকাজীর বাড়ী লুণ্ঠনের সময় হুসেন শাহ গৌড়ে ছিলেন না। উড়িষ্যায় যুদ্ধে গিয়াছিলেন। রামকেলি হইতেও তিনি হুসেন শাহের ভয়েই কেশব ছত্রী ও সনাতনের কথায় নীলাচলে ফিরিয়া গেলেন। হুসেন শাহের রাজত্বকালে গৌড়রাজ্যে মহাপ্রভুর অবস্থান নিরাপদ ছিল না।—

শ্রীরূপ-সনাতন রহে রামকেলি গ্রামে।
প্রভুকে মিলিয়া গেল আপন ভবনে॥
দুই ভাই বিষয় ত্যাগের উপায় সৃজিল।
বহু ধন দিয়া দুই ব্রাহ্মণ বরিল॥
কৃষ্ণ মন্ত্রে করাইল দুই পুরশ্চরণ।
অচিরাতে পাইবারে চৈতন্য চরণ॥
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ১৯শ পঃ)

—ম্লেচ্ছজাতিত্ব হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য ব্রাহ্মণ দিয়া পুরশ্চরণ করিতে হইল।

শ্রীরূপ নৌকাতে ভরিয়া বহু ধন লইয়া আপনার ঘরে আসিলেন।

গৌড়ে রাখিল মুদ্রা দশ হাজারে।
সনাতন ব্যয় করে রহে মুদি ঘরে॥

* * *

এথা সনাতন গোসাঞি ভাবে মনে মন।
রাজা মোরে প্রীতি করে সে মোর বন্ধন॥
কোন মতে রাজা যদি মোরে ক্রুদ্ধ হয়।
তবে অব্যাহতি হয় করিল নিশ্চয়॥
অস্বাস্থ্যের ছদ্ম করি রহে নিজ ঘরে।
রাজকার্য্য ছাড়িল না-যায় রাজদ্বারে॥
লোভী কায়স্থগণে রাজকার্য্য করে।
আপন স্বগৃহে করে শাস্ত্রের বিচারে॥

ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত বিশ-ত্রিশ লঞা।
ভাগবৎ বিচার করে সভাতে বসিয়া॥
আর দিন গৌড়েশ্বর সঙ্গে একজন।
আচম্বিতে গোসাঞি সভাতে কৈল আগমন॥
পাতসা দেখিয়া সবে সম্ভ্রমে উঠিলা।
সম্ভ্রমে আসন দিয়া রাজা বসাইলা॥
রাজা কহে তোমা স্থানে বৈদ্য পাঠাইল।
বৈদ্য কহে ব্যাধি নাহি সুস্থ যে দেখিল॥
আমার যা কিছু কার্য্য সব তোমা লঞা।
কার্য্য ছাড়ি রহিলা তুমি ঘরেতে বসিয়া॥
মোর যত কার্য্যকাম সব কৈলে নাশ।
কি তোমার হৃদয়ে আছে কহ মোর পাশ॥
সনাতন কহে নহে আমা হৈতে কাম।
আর একজন দিয়া কর সমাধান॥
তবে ক্রুদ্ধ হঞা রাজা কহে আরবার।
তোমার বড় ভাই করে দস্যু ব্যবহার॥
জীব পশু মারি কৈল চাকলা সব নাশ।
এথা তুমি কৈলে মোর সর্ব্বকার্য্য নাশ॥
সনাতন কহে তুমি স্বতন্ত্র গৌড়েশ্বর।
যেই যেই দোষ করে দেহ তার ফল॥
এতো শুনি গৌড়েশ্বর উঠি ঘরে গেলা।
পালাইবে বলি সনাতনে বান্ধিলা॥
হেনকালে গেল রাজা ওড়িয়া মারিতে।
সনাতনে কহে তুমি চল মোর সাথে॥
তিঁহো কহে যাবে তুমি দেবতা ভাঙিতে।
মোর শক্তি নাহি তোমার সঙ্গে যাইতে॥
তবে তারে বান্ধি রাখি করিলা গমন।

—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ১৯শ পঃ)

হুসেন শাহ আচম্বিতে সনাতনের বাড়ী আসিলেন

হুসেন শাহ সনাতনকে বন্দী করিলেন

হুসেন শাহ, প্রধান মন্ত্রী ও প্রাইভেট সেক্রেটারী (দবীর খাস্) সনাতন গোস্বামীকে বন্দী করিলেন কেন?

১ম। দবীর খাস্ অস্বাস্থ্যের ভান করিয়া রাজদরবারে যান না। লোভী কায়স্থগণ রাজকার্য্য করেন বটে, কিন্তু তাহাতে সনাতনের অভাব পূরণ হয় না।

২য়। তিনি বিশ-ত্রিশজন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত লইয়া বাড়ীতে শাস্ত্র আলোচনা করিতেছেন। সুতরাং ম্লেচ্ছজাতিতে পতিত হইলেও, তিনি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই।

৩য়। হুসেন শাহ উড়িষ্যা আক্রমণে যাইবেন। সনাতনকে সঙ্গে নিতে চান। তিনি তাহা যাইবেন না। তিনি স্পষ্ট হুসেন শাহকে বলিতেছেন—'তুমি যাবে ওড়িয়া মারিতে,' 'তুমি যাবে দেবতা ভাঙিতে,' আমি সঙ্গে যাব না। মহাপ্রভুর সহিত মিলনের প্রতিক্রিয়া সনাতনের মনে দেখা গেল।

৪র্থ। শ্রীরূপ আগেই পালাইয়া গিয়াছেন। সনাতনও পালাইয়া যাইতে পারেন। অতএব হুসেন শাহ কারাগারে তাঁকে বন্দী করিয়া, একাই সৈন্যসামন্ত লইয়া উড়িষ্যা-অভিযানে বহির্গত হইলেন।

এথা গৌড়ে সনাতন আছে বন্দিশালে।
শ্রীরূপ গোসাঞির পত্রী আইল হেনকালে॥
পত্রী পাঞা সনাতন আনন্দিত হৈলা।
যবনরক্ষক পাশ কহিতে লাগিলা॥
তুমি এক জিন্দাপীর মহাভাগ্যবান।
কেতাব কোরাণ শাস্ত্রে আছে তোমার জ্ঞান॥
এক বন্দী ছাড়ি যদি নিজ ধন দিয়া।
সংসার হইতে তারে মুক্ত করেন গোসাঞা॥
পূর্ব্বে আমি তোমার করিয়াছি উপকার।
তুমি আমা-ছাড়ি করো প্রত্যুপকার॥
পাঁচ সহস্র মুদ্রা তুমি কর অঙ্গিকার।
পুণ্য, অর্থ দুই লাভ হইবে তোমার॥
তবে সেই যবন কহে শুন মহাশয়।
তোমারে ছাড়িয়া কিন্তু করি রাজভয়॥

সনাতন কহে তুমি না কর রাজভয়।
দক্ষিণ গিয়াছে যদি লেউটি আইসয়॥
তাহাকে কহিও সেই বাহ্যকৃত্যে গেল।
গঙ্গার নিকট গঙ্গা দেখি ঝাঁপ দিল॥
কিছু ভয় নাহি আমি এদেশে না রব।
দরবেশ হঞা আমি মক্কায় যাইব॥
তথাপি যবন মন প্রসন্ন না দেখিল।
সাত হাজার মুদ্রা তার আগে রাশি কৈল॥
লোভ হইল যবনের মুদ্রা দেখিয়া।
রাত্রে গঙ্গা পার কৈল দাড়ুকা কাটিয়া॥
গড়িদ্বারপথ ছাড়িল নারে তাঁহা যাইতে।
রাত্রি দিনে চলি আইল পাতড়া পর্ব্বতে॥
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ২০শ পঃ)

সনাতন কারাগার হইতে মুক্তি পাইলেন

শ্রীসনাতন কারাগার হইতে মুক্তি পাইলেন। গৌড় হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত বিস্তৃত যে প্রশস্ত পথ, তাহাকেই বলে 'গড়িদ্বারপথ'। সনাতন এই পথে গেলেন না। কেননা, তাঁহার পলায়নের সংবাদ পাইলে গৌড় হইতে তাঁহাকে এইপথে অনুসরণ করিয়া পুনরায় গ্রেপ্তার করিতে পারে। কারা-রক্ষকের সহিত কথাবার্তায় তাঁহার ম্লেচ্ছ জাতিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেল। কারা-রক্ষককে তিনি বলিলেন—'দরবেশ হঞা আমি মক্কায় যাইব'। হয়তো তিনি দাড়ি রাখিয়াছেন। মুসলমানী বেশ অঙ্গে পরিধান করিয়াছেন। মক্কায় যাওয়াই তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। কাশী যাওয়া, ধারনার অতীত। অথচ তিনি মক্কায় না-যাইয়া কাশী অভিমুখেই যাত্রা করিলেন। গৌড়ের প্রধান-মন্ত্রীর জীবননাট্যের এই নাটকীয় উপাদান অতিশয় চিত্তাকর্ষক। তারপর, বেশ পরিবর্তন করিলেন। 'হাতে করোয়া ছিঁড়া কান্থা নির্ভয় হৈলা'—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ২০শ পঃ)। শুধু বৈরাগ্য নয়, রাস্তা চলিতে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে আত্মগোপন করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। হাজীপুর আসিয়া তাঁহার ভগ্নীপতি শ্রীকান্তের সহিত মিলিত হইলেন।

শ্রীকান্ত আবার 'করে রাজকাম'। অর্থাৎ, হুসেন শাহের কর্ম্মচারী। সনাতনকে তিনি দিনদুই থাকিতে বলিলেন।

গোসাঞি কহে একক্ষণ ইহা না রহিব।
গঙ্গা পার করি দেহ এক্ষণি চলিব॥
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ২০শ পঃ)

পলায়নমুখে সনাতন খুব দ্রুতগতিতে পথ চলিতেছেন।—

গঙ্গা পার করি দিল, গোসাঞি চলিল।
তবে বারাণসী গোসাঞি আইলা কত দিনে।
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ২০শ পঃ)

চৈতন্যভাগবতে সনাতনের সহিত রামকেলিতে মহাপ্রভুর এই প্রথম-সাক্ষাতের (১৫১৪ খৃঃ) কথা নাই। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সঙ্গেই ছিলেন। আর বৃন্দাবনদাস শ্রীপাদের শেষ সাক্ষাৎ-শিষ্য। তাঁর কাছে শুনিয়াই তিনি চৈতন্যভাগবৎ লিখিয়াছেন। তবে, এতবড় একটি ঘটনার অনুল্লেখ বিস্ময়কর। কবিরাজ গোস্বামী বৃন্দাবনে শ্রীসনাতনের মুখে শুনিয়া চৈতন্যচরিতামৃত (১৬১৫ খৃঃ) লিখিয়াছেন। সুতরাং চৈতন্যচরিতামৃতের প্রমাণ অবিশ্বাস করিবার হেতু নাই। বিশেষতঃ, বাংলাকে কেন্দ্র করিয়াই চৈতন্যভাগবৎ লেখা হইয়াছে। আর রামকেলির প্রথম-সাক্ষাৎ গৌড়ের অতি নিকটের ঘটনা। তবু বৃন্দাবনদাস ইহা বিস্মৃত হইলেন কেন—বুঝা গেল না।

রামকেলিতে সাক্ষাতের সময়—মাত্র একদিন। কাশীতে—দুই মাস। নীলাচলে—এক বৎসর। এখন, কাশীর কথাই হইতেছে। মহাপ্রভু মথুরা-বৃন্দাবন হইতে ফিরিতেছেন। প্রয়াগে শ্রীরূপকে দশদিন যাবৎ রসতত্ত্ব (Rhetoric) সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়া বৃন্দাবন পাঠাইয়াছেন।—

"রামানন্দ পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিলা।
শ্রীরূপে কৃপা করি সব তাহা কহিলা॥"

কাশীতে সনাতনের জন্য অপেক্ষা করিয়া চন্দ্রশেখর-ভবনে অবস্থান

কাশীতে সনাতনের সহিত মহাপ্রভুর মিলন

করিতেছেন। এমন সময় 'বাহির দুয়ারে' শ্রীসনাতন আসিয়া উপনীত হইলেন। প্রভু বলিলেন—দ্বারে এক বৈষ্ণব আসিয়াছেন, তাঁহাকে আমার কাছে ডাকিয়া আন। চন্দ্রশেখর ফিরিয়া আসিয়া বলিল—বৈষ্ণব কেহ নাই, তবে একজন দরবেশ (মুসলমান ফকির) দ্বারে বসিয়া আছেন। প্রভু বলিলেন—ঠিক হইয়াছে, তাঁহাকেই ডাক।

মহাপ্রভু সনাতনকে অত্যন্ত সমাদরে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার গাত্রে শ্রীহস্ত বুলাইলেন। আলিঙ্গন করিলেন। নিজের পার্শ্বে 'পিণ্ডার' উপর বসাইলেন। সনাতন ইহাতে 'বিস্তর কুণ্ঠা' প্রকাশ করিলেন। এবং স্পষ্টই মহাপ্রভুকে বলিলেন যে, তিনি ম্লেচ্ছজাতি। তাঁহাকে স্পর্শ করা প্রভুর কোনক্রমেই সঙ্গত নয়। প্রভু উত্তরে বলিলেন—তুমি ভক্তিবলে ব্রহ্মাণ্ড উদ্ধার করিতে পার। তোমাকে আমি স্পর্শ করি নিজে পবিত্র হইবার জন্য। তোমাকে আমি দেখি, তোমাকে আমি স্পর্শ করি, তোমার গুণ আমি গাই—ইহাতে আমার অপার আনন্দ।

প্রভু চন্দ্রশেখরকে বলিলেন—

দ্বারে এক বৈষ্ণব হয় বোলাহ তাহারে।
চন্দ্রশেখর দেখে বৈষ্ণব নাহিক দুয়ারে॥
দ্বারেতে বৈষ্ণব নাহি প্রভুকে কহিল।
কেহ হয়, করি প্রভু তাহারে পুছিল॥
তিঁহ কহে এক দরবেশ আছে দ্বারে।
তাঁরে আন, প্রভু বাক্যে কহিল তাহারে॥
প্রভু তোমায় বোলায় আইস দরবেশ।
শুনি আনন্দে সনাতন করিল প্রবেশ॥
তাঁহারে অঙ্গনে দেখি প্রভু ধাঞা আইলা।
তাঁরে আলিঙ্গন করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা॥
প্রভুস্পর্শে প্রেমাবিষ্ট হৈলা সনাতন।
মোরে না ছুঁইহ কহে গদগদ বচন॥

দুইজনে গলাগলি রোদন অপার।
দেখি চন্দ্রশেখরের হৈল চমৎকার॥
তবে প্রভু তাঁর হাত ধরি লঞা গেলা।
পিণ্ডার উপর আপন পাশে বসাইলা॥
শ্রীহস্তে করেন তার অঙ্গ সম্মার্জ্জন।
তিঁহো কহে প্রভু মোরে না কর স্পর্শন॥
প্রভু কহে তোমা স্পর্শি আত্ম পবিত্রিতে।
ভক্তিবলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে॥
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ২০শ পঃ)

কবিরাজ গোস্বামী, বৃন্দাবনে শ্রীসনাতনের মুখ হইতে এইসব কথা শুনিয়া লিখিয়াছেন। এই দুই মহাপণ্ডিত বিনয়ী ভক্ত। বৈষ্ণব। কেহ মিথ্যা কথা বলেনও নাই এবং কেহ মিথ্যা কথা লেখেনও নাই।

প্রভু সনাতনকে বেশ-পরিবর্তন করাইলেন। এমন কি, ক্ষৌর করাইলেন। অঙ্গে ভোটকম্বলখানিও মহাপ্রভুর দৃষ্টিনিক্ষেপে বিদূরিত হইল। চন্দ্রশেখরের নিকট একখানা পুরাতন বস্ত্র লইয়া অন্তর্বাস ও বহির্বাস প্রস্তুত করিয়া লইলেন। গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে মাধুকরী মাগিয়া খাইবার ব্যবস্থা করিলেন। সনাতনকে প্রভু নিভৃতে কাছে রাখিয়া দিনের পর দিন শিক্ষা দিতে লাগিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতের মত অনুযায়ী দেখা যায়—এই শিক্ষাপদ্ধতি মনোবিজ্ঞানকে ভিত্তি করিয়া ক্রমবিকাশের পথে অতি সুন্দর পরিণতি লাভ করিয়াছে। সোপানপরম্পরার মত, এই শিক্ষাপদ্ধতি একের পর এক ধর্ম্মরাজ্যে উন্নতির দিকে সাধককে লইয়া যাইতেছে। যিনি শিক্ষা দিতেছেন, তিনি শুধু মুখে কথা বলিতেছেন না। কথা অনুযায়ী নিজে দেহে ও মনে ভাবান্তর প্রাপ্ত হইয়া শিষ্যের সম্মুখে প্রকট হইতেছেন। ভাব-সমাধির কথা বলিতে গিয়া প্রভু বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছেন। ভাব-সমাধি বস্তু কী—নিজে সমাধিগ্রস্থ হইয়া সনাতনকে তাহা দেখাইতেছেন। এইরূপে কিছুক্ষণ থাকিয়া, পুনঃ বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া

সনাতনকে শিক্ষাদান মনোবিজ্ঞান সম্মত

আসিলে আবার বলিতে আরম্ভ করিতেছেন। ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে অদ্বৈত বেদান্ত ও মায়াবাদের সর্ব্বপ্রধান দুর্গ কাশীতীর্থে বসিয়া যে-বাঙ্গালী শঙ্কর বেদান্তকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত নিরসন করিতেছেন, তাঁহার দার্শনিক চিন্তার গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনের বল ও সাহসের পরিমাণ চিন্তা করিয়া আমরা আজ পাঁচ শতাব্দী পরে বিস্ময়ে অভিভূত না-হইয়া পারিতেছি না। সনাতনকে শিক্ষা দিতে সঙ্কল্প করিয়াই প্রভু কাশীতীর্থে অপেক্ষা করিতেছিলেন। শঙ্কর বেদান্ত খণ্ডন করিতে গিয়া তিনি অন্যান্য স্থান ছাড়িয়া অদ্বৈত বেদান্তের কেন্দ্র কাশীতীর্থকেই বাছিয়া লইলেন কেন—ইহা আমাদিগের চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয়। এই প্রশ্ন আমাদের দৃষ্টিকে সহসা এবং সহজে এড়াইয়া যাইতে পারিতেছে না।

শ্রীরূপকে প্রভু গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের রসতত্ত্ব বুঝাইয়াছেন। শ্রীসনাতনকে এখন তিনি 'ভক্তির সিদ্ধান্ত' (philosophy) বুঝাইতে আরম্ভ করিতেছেন। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"সনাতন কৃপায় পেনু ভক্তির সিদ্ধান্ত।
শ্রীরূপ কৃপায় পেনু রসভাব প্রান্ত ॥"

শ্রীভাগবতকে অবলম্বন করিয়াই প্রভু তাঁহার প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের দার্শনিক ভিত্তি স্থাপন করিতে যাইতেছেন। ইহা পরে শ্রীজীব গোস্বামীর ষট্-সন্দর্ভে পরিপূর্ণ রূপ প্রাপ্ত হইবে।

শ্রীভাগবতে-কথিত সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন—এই তিনটি সুস্পষ্ট ভাগে তিনি সনাতনকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। সম্বন্ধ বিভাগে ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যার বিবর্ত্তন-পথে তিনি কৃষ্ণতত্ত্ব,

সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন

সৃষ্টিতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, লীলাতত্ত্ব প্রভৃতি ব্যাখ্যা করিলেন। শঙ্কর বেদান্ত বলে—জীব আর ব্রহ্ম এক। সাধক নিজে চিন্তা করিবেন—অহম্ ব্রহ্মাস্মি, আমিই ব্রহ্ম। গুরু শিষ্যকে বলিবেন—তৎ ত্বম্ অসি, তুমিই ব্রহ্ম। যিনি শৈব, তিনিও অদ্বৈতের ভূমিতে দাঁড়াইয়াই

বলিবেন—শিবোহম্, আমিই শিব। অদ্বৈত বেদান্তের দ্বারা অতিমাত্রায় আক্রান্ত আচ্ছন্ন ভারতের সর্ব্বপ্রাচীন তীর্থে বসিয়া প্রভু সনাতনকে সম্মুখে রাখিয়া ঘোষণা করিলেন—'জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস'।

প্রভু আক্ষেপ করিতেছেন—

"কৃষ্ণের নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি গেল।
এই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল॥"

অনাদি হইতে অনন্তকাল—জীব আর কৃষ্ণ অর্থাৎ ব্রহ্ম, ভিন্ন। এক নয়। যেহেতু, জীব সর্ব্বকালে এবং সর্ব্ব অবস্থাতে কৃষ্ণের দাস মাত্র। ইহা শঙ্করের অতি সুস্পষ্ট প্রতিবাদ। সনাতনকে সম্মুখে রাখিয়া পাঁচ শতাব্দী পূর্ব্বে এই প্রতিবাদ তিনি করিয়া গিয়াছেন। অবশ্যই একথা স্বীকার করিতে হইবে যে—জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ-নির্ণয়ে তিনি পুরাপুরি দ্বৈতবাদী ছিলেন না। ভেদাভেদ-তত্ত্ব বিশ্লেষণে জীব ব্রহ্ম হইতে কোন্ অংশে ভেদ এবং কোন্ অংশে অভেদ—এমন আভাস এবং ইঙ্গিতও তাঁহার কথায় আমরা পাই।

জীবতত্ত্ব ছাড়িয়া সৃষ্টিতত্ত্বের বিচারে সাংখ্য, বেদান্ত ও পুরাণ—এ তিনেরই আশ্রয় তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। তিনের সংমিশ্রণে তিনি সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা বলিলেও ঠিক বলা হইবে না। এই তিনকে অতিক্রম করিয়াও তিনি নিজে স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে নূতন কিছু বলিয়াছেন। কৃষ্ণের স্বাভাবিক যে তিন শক্তি—চিৎশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি—ইহার ব্যাখ্যা বেদান্ত-অনুগামী হইলেও ইহার অভিনবত্ব অস্বীকার করা যায় না।—

মায়া দ্বারে সৃজেন তিঁহ ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
জড় রূপ প্রকৃতি নহে ব্রহ্মাণ্ড কারণ॥
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ২০শ পঃ)

ইহাতে সাংখ্য ও বেদান্তের সংমিশ্রণ রহিয়াছে। মায়ার অস্তিত্বও

স্বীকার করা হইয়াছে। অন্যান্য স্থানেও মায়ার উল্লেখ আমরা দেখিতে পাই। আশঙ্কা হয়, মায়াকে অতিক্রম করা মহাপ্রভুর পক্ষেও কঠিন কার্য্য ছিল। কে জানে, অপ্রাকৃতকে ছাড়িয়া প্রাকৃতের আবরণে সেই মায়াই আবার মুখোস বদলাইয়া বৈষ্ণবের দার্শনিক পংক্তিভোজনে ফিরিয়া আসিল কি-না! চৈতন্যচরিতামৃতকারের মতে—প্রাকৃত আর অপ্রাকৃতের জন্ম যদি একই ক্ষণে হইয়া থাকে, তবে অপ্রাকৃতের মত প্রাকৃতের অস্তিত্বও তো অস্বীকার করা যায় না।—

প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি কৈলা এককক্ষণে।

—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ২১শ পঃ)

আর এই প্রাকৃতই ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবের হস্তে মায়ার ষোড়শ শতাব্দীর রূপান্তর বলিয়া মনে হয়।

সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যেই ঐতিহাসিক বিবর্ত্তন-পথে অবতার-তত্ত্ব দেখা দিয়াছে। মহাপ্রভু-বর্ণিত অবতারবাদ বৈদান্তিক অবতারবাদকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছে।—ইহাও একদিক দিয়া বেদান্তের প্রতিবাদ। অদ্বৈত বেদান্ত বলে—আত্মাংশে জীব যতই মায়ামুক্ত হয়, ততই তাহার ব্রহ্মস্বরূপ দেখা দেয়। আত্মাংশে জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস নহে। জ্ঞান দ্বারা জীব আত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানে। বেদান্ত বলে—ব্রহ্মবিৎ বহ্মৈব ভবতি।

ব্রহ্মকে জানিলে, জীব ব্রহ্ম হইয়া যায়। এইরূপে ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মভাবাপন্ন জীব ব্রহ্ম-দৃষ্টিতে নিজেকে ব্রহ্ম বলিয়া ভাবিতেও পারেন, কহিতেও পারেন। যদি এই দিক দিয়া বিচার করা যায়, তবে একথা স্বতঃসিদ্ধ অযৌক্তিক নিশ্চয়ই নয় যে—মায়ামুক্ত উপাধিবর্জ্জিত প্রত্যেক জীবই ব্রহ্মের অবতার।—ইহাই বৈদান্তিক অবতারবাদ।

মহাপ্রভু সনাতনকে শিক্ষা দিতে গিয়া এই বৈদান্তিক অবতারবাদের প্রতিবাদ করিয়াছেন। সনাতন তাঁহার শ্রীমুখ হইতে যে অবতারবাদের কথা শুনিয়াছিলেন, তাহা চারিটি ভাগে বিভক্ত।

যথা—লীলাবতার, গুণাবতার, মন্বান্তর-অবতার ও যুগ-অবতার। ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার বিবর্ত্তন-পথে মহাপ্রভু-বর্ণিত এই অভিনব অবতারবাদ পৌরাণিকী বলিয়া অভিহিত। বৈদান্তিক অবতার-বাদের সহিত ইহার স্বাতন্ত্র্য সুপরিস্ফুট।

এই অবতারবাদ বলে যে—ব্রহ্ম কখনো কখনো জীবের উদ্ধারের জন্য মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া মনুষ্যদিগের মধ্যেই অবতীর্ণ হন। অবতারের কতকগুলি শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ মহাপ্রভু সনাতনকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। এই লক্ষণাক্রান্ত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সমস্ত অবতারই জীব-উদ্ধারের জন্য এইরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহা বৈদান্তিক অবতারবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী না-হইলেও, তাহা হইতে সম্যকরূপে ভিন্ন।

সনাতন মহাপ্রভুকে স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করিলেন—কলিযুগে অবতার কে? মহাপ্রভু উত্তর করিলেন—'অবতার শাস্ত্রদ্বারা জানি'; আর কলিযুগে কলিই অবতার। সনাতনের ভাবে ও ভঙ্গিতে যেন আর একটি প্রশ্ন ফুটিয়া উঠিল। তাহার অর্থ—তুমি কে? যদিও বহু গ্রন্থে বহুস্থানে মহাপ্রভু এই প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট করিয়াই দিয়াছেন যে, আমি কৃষ্ণের দাস, আমি ক্ষুদ্র জীবমাত্র—তথাপি এবার সহসা বজ্রনির্ঘোষে তিনি এক রহস্যের অবতারণা করিলেন। প্রভু কহিলেন—

অবতার নাহি কহে আমি অবতার।

—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ২০শ পঃ)

অবতারত্ব সম্পর্কে মহাপ্রভুর চরিত্রে পর পর দুইটি ভাব দেখা যায়

মহাপ্রভুর চরিত্র-বিশ্লেষণে আমরা তাঁহার মধ্যে পর পর দুইটি ভাব দেখিতে পাই। নবদ্বীপ-লীলায় যখন 'মুই সেই, মুই সেই, বলি প্রভু করিলা হুঙ্কার' —তখন তিনি নিজেকে কৃষ্ণের অবতার বলিয়াই বিশ্বাস করিলেন। বিশ্বাস না-করিলে, তিনি ও-কথা বলিবেন কেন? শ্রীবাসকেও তিনি বলিয়াছিলেন—

"কাহারে বা পূজিস, করিস কার ধ্যান।
যাঁহারে পূজিস তাঁরে দ্যাখ বিদ্যমান॥"

নীলাচলে বাসুদেব সার্ব্বভৌম তাঁহাকে সাধারণ মানুষ ভাবিয়াছিলেন। এবং তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণের অধিকার লইয়া কথা তুলিয়াছিলেন। তখন ভাবাবেশে উন্মত্ত হইয়া তিনি গর্জ্জন করিয়া বলিয়াছিলেন—"কিরে সার্ব্বভৌমা, সন্ন্যাসের কিরে মোর নাহি অধিকার।"

এইসকল ক্ষেত্রে তিনি অবতার-ভাবে ভাবিত হইয়া কথা বলিয়াছেন। আবার বৃন্দাবনে কালীদহে রজনীতে কৃষ্ণ দেখা দিয়াছেন বলিয়া কোলাহল উত্থিত হইলে, তখন তিনি বলিলেন—

কৃষ্ণ কেন দরশন দিবে কলিকালে।
নিজ ভ্রমে মূর্খ লোক করে কোলাহলে॥
বাতুল না হইও ঘরে রহত বসিয়া।
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ১৮শ পঃ)

সেখানে তাঁহাকে প্রশ্নও করা হইয়াছিল যে—আপনিই ত কৃষ্ণের অবতার। উত্তরে প্রভু জিভ কাটিয়া বলিলেন—

বিষ্ণু বিষ্ণু, ইহা না কহিও।
জীবাধমে কৃষ্ণ জ্ঞান কভু না করিও॥
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ১৮শ পঃ)

এখানে তিনি নিজেকে জীবাধম বলিতেছেন। সুতরাং অবতার-ভাব এবং জীব-ভাব পর পর তাঁহার মনোরাজ্যে ক্রিয়া করিয়াছে।

বেদান্ত-মতে আত্মাংশে প্রত্যেক সাধারণ জীবই যদি ব্রহ্ম হয়, তবে মহাপ্রভুর মত অসাধারণ অতিমানব যে কত সুপরিস্ফুটরূপে ব্রহ্মের অবতার, তাহা কি বলিয়া শেষ করা যায়? যাঁহারা পুরা অদ্বৈতমতে বৈদান্তিক, এই দিক দিয়া বিচার করিলে তাঁহারাও মহাপ্রভুকে অবশ্যই ব্রহ্মের অবতার বলিয়া স্বীকার করিবেন—আশা করা যায়।

সৃষ্টিতত্ত্ব ছাড়িয়া সম্বন্ধ অধ্যায়ে মহাপ্রভু-বর্ণিত ব্রহ্মতত্ত্বের দিকে এখন আমরা অগ্রসর হইতেছি। ভারতীয় সুপ্রাচীন ও ঔপনিষদিক এই ব্রহ্মতত্ত্বকে, মহাপ্রভু সনাতনের নিকট কৃষ্ণতত্ত্বরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের নিকট পাঁচ শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই কৃষ্ণতত্ত্বই ব্রহ্মতত্ত্ব। সনাতনের নিকট এই কৃষ্ণতত্ত্বকে প্রভু আবার দুইভাগে বিভক্ত করিয়া দেখাইয়াছেন। এবং কৃষ্ণের অন্তরঙ্গা (চিৎশক্তি), বহিরঙ্গা (মায়াশক্তি), তটস্থা (জীবশক্তি)-বিষয় অনেকটা বেদান্তানুগামী হইয়া ব্যাখ্যা করিয়াও কৃষ্ণকে ব্রহ্ম (নির্ব্বিশেষ), পরমাত্মা (কৃষ্ণের একাংশ), ভগবান (ভক্তের আরাধ্য ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ এক নিত্যকালস্থায়ী বিগ্রহ)-রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। কৃষ্ণ-তত্ত্বের মহাপ্রভু-বর্ণিত ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যে বিভক্ত যে দুইভাগ—সম্বন্ধ অধ্যায়ে সৃষ্টিতত্ত্ব, অবতারতত্ত্ব ও জীবতত্ত্বের আভাসে সেই ঐশ্বর্য্যতত্ত্ব এতক্ষণ দেখান হইল।

ঐশ্বর্য্যতত্ত্ব

তারপর মহাপ্রভু সনাতনকে কৃষ্ণের মাধুর্য্যতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ করিলেন। ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মাধুর্য্যের উপরই মহাপ্রভু অধিক জোর দিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ অপেক্ষা বৃন্দাবনের কৃষ্ণই স্থূল ও সূক্ষ্মে, রূপ ও সুরে—অধিকতর প্রাচুর্য্যে বর্ণিত হইয়াছেন। আর ঐতিহাসিক একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে—শ্রীমৎভাগবতের বৃন্দাবন যেখানেই হউক আর যা-ই হউক, বিংশ শতাব্দীতে যে বৃন্দাবন আমরা দেখিতেছি তাহা অবিসংবাদিতরূপে ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালীর কীর্ত্তি। বাঙ্গালীর সৃষ্টি। মহাপ্রভুর কল্পনায়, রূপ-সনাতন প্রভৃতি গোস্বামিগণের জীবনপণ সাধনায়, উত্তর ভারতের বাঙ্গালীর এই তীর্থ পাঁচ শতাব্দী পূর্ব্বে এই সময় ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছিল। দীর্ঘ এই পাঁচ শতাব্দীর মধ্যে উত্তর ভারতের তোরণ-দ্বারে কত বড় বড় রাজপ্রতাপের প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণ আমরা বৃন্দাবনের অনতিদূরে আগ্রা ও দিল্লীতে নিরীক্ষণ করিলাম। মোগল কত বড় একটা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিল। আবার সে-সাম্রাজ্য

মাত্র দুইটি শতাব্দীর অল্পকাল মধ্যেই দেখিতে দেখিতে ভাঙ্গিয়াও গেল। আজিকার বৃন্দাবন তার আধ্যাত্মিকতার গৌরবকে হয়তো সমস্ত দিকে অক্ষত রাখিতে পারে নাই। কিন্তু তবুও সে মরে নাই। মহাপ্রভুর কল্পনায় যে লুপ্ততীর্থের নবকলেবর হইয়াছিল, প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল—আজিও তাহা বাঁচিয়া আছে। বাঙ্গালীকে মনে রাখিতে হইবে যে—আগে নবদ্বীপ, পরে বৃন্দাবন। নবদ্বীপই বৃন্দাবনকে সম্ভব করিয়াছে।

মহাপ্রভু কর্ত্তৃক সনাতনকে শিক্ষা প্রদানের গুরুত্ব ও সফলতা অত্যন্ত অধিক। এই জন্যই সনাতনের নিকট কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য বর্ণনাকালে যদিও প্রভুর কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হইয়াছিল, কিন্তু মাধুর্য্য বর্ণনাকালে তাঁহার নিজের স্বীকার-উক্তিতেই আমরা দেখিতে পাই যে তিনি সেই স্রোতে একেবারে বহিয়া গিয়াছিলেন।—

মাধুর্য্যতত্ত্ব

মোর চিত্ত ভ্রম করি নিজৈশ্বর্য্য মাধুরী
মোর মুখে শুনায় তোমারে।
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ২১শ পঃ)

আবার বলিতেছেন—

আমি ত বাউল, আন কহিতে আন কহি।
কৃষ্ণের মাধুর্য্য স্রোতে আমি যাই বহি॥
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ২২শ পঃ)

প্রভু সনাতনকে স্পষ্টই বলিলেন যে, কৃষ্ণের যে মাধুর্য্য তা নারায়ণে নাই—'এ মাধুর্য্য নাহি নারায়ণে'।—

তাতে সাক্ষী সেই রমা নারায়ণের প্রিয়তমা
পতিব্রতাগণের উপাস্যা।
তিঁহো সে মাধুর্য্য লোভে ছাড়ি সব কাম ভোগে
ব্রত করি করিল তপস্যা॥

লক্ষ্মী নারায়ণকে ছাড়িয়া, কৃষ্ণের মাধুর্য্যালোভে কৃষ্ণসঙ্গম বাঞ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়, রাসে লক্ষ্মীর স্থান হয় নাই। কারণ, লক্ষ্মী গোপী-ভাব লইয়া অগ্রসর হইতে পারেন নাই।

প্রভু বলিতেছেন—

সখি হে, কোন্ তপ কৈল গোপীগণে।
কৃষ্ণরূপ সুমাধুরী পিবি পিবি নেত্র ভরি
শ্লাঘ্য করে জন্ম তনু মনে॥

তখনকারদিনে ঈশ্বরলাভের জন্য প্রচলিত যে-সকল সাধন-পদ্ধতি ছিল, তাহা অপেক্ষা রাগমার্গে মাধুর্য্য-ভজনকেই প্রভু সনাতনের নিকট অধিকতর শ্রেষ্ঠ বলিয়া অকুণ্ঠিতচিত্তে ঘোষণা করিলেন।—

কর্ম্ম তপ যোগ জ্ঞান বিধি ভক্তি জপ ধ্যান
ইহা হইতে মাধুর্য্য দুর্লভ।
কেবল যে রাগমার্গে ভজে কৃষ্ণ অনুরাগে
তারে কৃষ্ণ মাধুর্য্য সুলভ॥

—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ২১শ পঃ)

ইহাই যদি মহাপ্রভু-বর্ণিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম হয়, তবে আজ পাঁচ শতাব্দী ধরিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের ধর্ম্মসাধনায় রাগমার্গে যদি মাধুর্য্যের ভজনকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়া আসিয়া থাকেন, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। বরং তাঁহারা, দোষই হউক আর গুণই হউক, এই ধর্ম্মের বিশেষত্বের উপরেই যথাসাধ্য জোর দিয়া আসিতেছেন।

কিন্তু একটা ভাবিবার কথা আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে রাজা রামমোহন রায়, এবং ঐ শতাব্দীর তৃতীয় ভাগে বঙ্কিম, শেষ ভাগে স্বামী বিবেকানন্দ, এমন কি বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এই কথাটি বিশেষ করিয়া ভাবিয়া গিয়াছেন। কথাটি এই যে—কান্তভাবাক্রান্ত পরকিয়াবাদে আচ্ছন্ন রাগমার্গে এই মাধুর্য্যের ভজন, গত পাঁচ শত বৎসর বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্রকে যে-দিকে এবং যে-ভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে, তাহার ফল কিরূপ দাঁড়াইয়াছে?

ভাল হইয়াছে, কি, মন্দ হইয়াছে? কেহ বলেন ভাল হইয়াছে, কেহ বলেন মন্দ হইয়াছে।

বস্তুতঃ চৈতন্যচরিতামৃতে, সনাতনকে শিক্ষা ও দীক্ষা দিবার সময়, কবিরাজ গোস্বামী মহাপ্রভুর মুখ দিয়া যে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গলাদেশে আজ পাঁচ শতাব্দীরও অধিককাল যাবৎ আলোচিত হইলেও অদ্যাপি সেই আলোচনার প্রয়োজন শেষ হয় নাই। জাতীয় চরিত্রের কোন কোন দিক এই ধর্ম্মদ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু আবার কোনো কোনো দিক যে ভাবোন্মাদের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ অবসাদগ্রস্ত হয় নাই, জড়তাগ্রস্ত হয় নাই, দুর্ব্বল হইয়া পড়ে নাই—একথা বলাও নিতান্তই দুঃসাহসের কার্য্য। কেননা, অন্যান্য কারণের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া কোন বিশেষ ধর্ম্ম বা কোন ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য একটা জাতীয় চরিত্রকে কিরূপ গঠিত করে, সংশোধিত করে, পরিবর্ত্তিত করে—তাহা আমরা এখন বিধিমত বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে পারি। আর বাঙ্গালীর বর্তমান জাতীয় চরিত্র দোষগুণে আমাদের শুধু অনুমানের বস্তু নয়, ইহা প্রত্যক্ষ।

কথায় কথায় আমরা অনেকদূর আসিয়া পড়িলাম। এখন প্রত্যাবর্তন করা যাক।

ঐশ্বর্য্য কহিতে প্রভুর কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হইল।
মাধুর্য্যে মজিল মন এক শ্লোক পড়িল॥

—শ্লোকটি শ্রীমদ্ভাগবতের ৩য় স্কন্ধে ২য় অধ্যায়ের ১২শ শ্লোক, যাহা বিদুরের প্রতি উদ্ধব বলিতেছেন।

এই শ্লোক পাঠের পর প্রভু সনাতনের নিকট কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিতেছেন। এই রূপ বর্ণনাকালে, এমন একটি তত্ত্ব মহাপ্রভুর শ্রীমুখ হইতে প্রকাশ পাইল, যাহা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে এক নূতন কথা। এমন কি, ধর্ম্মজগতেও প্রচলিত মতবাদের বিরোধী।

ঈশ্বরের প্রকাশ মনুষ্য-লীলাতেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

প্রভু বলিলেন যে—ঈশ্বরের যত রকমের প্রকাশ বা লীলা আছে,

তার মধ্যে মনুষ্যলীলাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। দেবদেবীবাদ, মূর্ত্তিপূজা, অবতার-বাদ—এ সমস্তেরও উপরে মানবতার আসন। মনুষ্যেই ঈশ্বরের সবচেয়ে বড় প্রকাশ।—

কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপ বেশ বেণুকর নব কিশোর নটবর
নরলীলা হয় অনুরূপ॥

কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন।
যে রূপের এক কণ ডুবায় সব ত্রিভুবন
সর্ব্ব প্রাণী করে আকর্ষণ॥
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ২১শ পঃ)

মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের প্রকাশ সবচেয়ে বড়। সবচেয়ে সার্থক। কিন্তু মানুষের মধ্যেই তার প্রকাশের শেষ নয়। কেননা, তাঁর রূপের মাত্র এক কণিকা সমস্ত বিশ্বসংসারকে 'ডুবায়'। তবে সেই বিরাট রূপের কত বড় অংশ অব্যক্ত! আর এই রূপ কিছু জড়বস্তুও নয়। যেহেতু ত্রিভুবনের সমস্ত প্রাণীকে আকর্ষণ করিয়া নিয়মিত করিবার, চালিত করিবার শক্তি এ রাখে।

এখন প্রশ্ন: এই রূপ আসিল কোথা হইতে? উত্তর: 'প্রকট কৈল নিত্যলীলা হইতে'। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, নিত্য-লীলা বলিয়া একটা-কিছু আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের লীলাবাদে এই 'নিত্যে'র স্থান নির্দ্দেশ ও হৃদয়ঙ্গম করিতে না-পারিলে, ইহার দার্শনিকতা বুঝা কঠিন। যা-কিছু এখানে প্রকাশ, তা সমস্তই 'নিত্য' হইতে আসিতেছে। এখান হইতে যা চলিয়া গেল বলিয়া আমরা মনে করিতেছি, তাহা লুপ্ত হইল না। 'নিত্যে' তাহা ফিরিয়া গেল মাত্র। সেইজন্য একশ্রেণীর বৈষ্ণব-দার্শনিক বলেন যে—মহাপ্রভুর লীলা এখনও 'নিত্যে'র মধ্যে হইতেছে। এমন কি, কোন কোন ভাগ্যবান ইহা দেখিতেও পায়। 'নিত্য' যদি থাকেই, তবে তাহা যে দেখিতে

পায়, সে ভাগ্যবান—তাহাতে আর সন্দেহ কি। তবে পরিতাপের বিষয় এই যে, ভাগ্যবানের সংখ্যা সংসারে কত কম।

এখন, 'নিত্য' হইতেই যদি এই রূপের উদ্ভব হয়, তবে এই রূপও অ-নিত্য হইতে পারে না। সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছিতে গেলে, রূপের প্রসঙ্গে শঙ্কর বেদান্ত ও মহাপ্রভু-বর্ণিত লীলাবাদ পরস্পর-বিরোধী। শঙ্কর মায়াবাদে, রূপ মিথ্যা। মহাপ্রভুর লীলাবাদে, রূপ সত্য। আবার শুধু রূপ নয়, মধুর রূপ। কাজেই—

রূপ দেখি আপনার কৃষ্ণের হৈল চমৎকার
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।

নিজের রূপকেই নিজের আস্বাদন করিতে ইচ্ছা হইল। আধুনিক মনোবিজ্ঞানে ইহার হয়তো প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়।—

চড়ি গোপী মনোরথে মন্মথের মনমথে
নাম ধরে মদনমোহন।
জিনি পঞ্চশর দর্প স্বয়ং নব কন্দর্প
রাস করে লঞা গোপীগণ॥

নিজ সম সখা সঙ্গে গোগণ চারণ রঙ্গে
বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দে বিহার।
যার বেণু ধ্বনি শুনি স্থাবর জঙ্গম প্রাণী
পুলক কম্প অশ্রু বহে ধার॥

—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ২১শ পঃ)

—চারটি শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে, কাব্যাংশে ইহার তুলনা কোথায়!

কৃষ্ণ-রূপ প্রসঙ্গ শেষ হয় নাই। চলিতেছে। কিন্তু তারই মধ্যে যেন মনে হয় 'সার্দ্ধ চব্বিশ অক্ষর'-সমন্বিত কামগায়ত্রী মন্ত্র প্রভু সনাতনকে দিলেন। এবং এই মন্ত্রকেই কৃষ্ণের স্বরূপ বলিয়া বুঝাইলেন। চৈতন্যচরিতকার মন্ত্রটি উল্লেখ করেন নাই। কেননা,

মন্ত্র অপ্রকাশ্য। (কামবীজ=ক্লীং, কামগায়ত্রী=কামদেবায় বিদ্মহে, পুষ্প বাণায় ধীমহি, তন্নোনঙ্গ প্রচোদয়াৎ।) তবে তাহার ইঙ্গিত খুব সুস্পষ্ট।—

কাম গায়ত্রী মন্ত্ররূপ হয় কৃষ্ণের স্বরূপ
সার্দ্ধ চব্বিশ অক্ষর তার হয়।
সে অক্ষর চন্দ্র হয় কৃষ্ণে করিল উদয়
ত্রিজগৎ কৈল কামময়॥
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ২১শ পঃ)

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মাধুর্য্যের প্রসঙ্গে স্থূল হইতে সূক্ষ্মে, রূপ হইতে সুরে, একটা ধারাবাহিক গতি এবং ক্রমপরিণতি লক্ষ্য করা যায়।—

বংশী ছিদ্র আকাশে তার গুণ শব্দে পৈশে
ধ্বনি রূপে পাইয়া পরিণামে।
সে ধ্বনি চৌদিকে ধায় অন্তর্ভেদি বৈকুণ্ঠে যায়
বলে পৈশে জগতের কানে।
* * *
কানের ভিতর বাসা করে আপনি তাহা সদা স্ফুরে
অন্য শব্দ না দেয় প্রবেশিতে।
আনকথা না শুনে কান আন বলিতে বলে আন
এই কৃষ্ণের বংশীর চরিতে॥
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ২১শ পঃ)

রূপে যে মাধুর্য্যের আরম্ভ প্রভু করিয়াছিলেন, সুরে আসিয়া তা শেষ হইল। বলিতে বলিতে এইখানে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইয়াছিল।

সম্বন্ধ বিভাগে কৃষ্ণতত্ত্বের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য বর্ণনার আভাস আপনারা পাইলেন। ইহা শ্রীজীব গোস্বামীর ষট্-সন্দর্ভের অনুগামী

হইলেও কাব্যাংশে কবিরাজ গোস্বামীর মৌলিকতা ও অভিনবত্ব, অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দৃষ্টি এড়াইয়া যাইবে না।

এখন, প্রভু অভিধেয় বিভাগের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছেন। সম্বন্ধ বিভাগে প্রভু সনাতনকে ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝাইলেন। কিন্তু তত্ত্ব বুঝা এক কথা, আর ঈশ্বর লাভ করা ভিন্ন কথা। না হইলেও ঠিক সেই কথাই নয়। অভিধেয় বিভাগে ঈশ্বর লাভের উপায় প্রভু বুঝাইয়া দিলেন।

কাশীতীর্থে বসিয়া সনাতনকে প্রভু বলিলেন যে—কেবল জ্ঞান, মুক্তি দিতে পারে না। এখানেও আমরা শঙ্কর বেদান্তের স্পষ্ট প্রতিবাদ দেখিতে পাই। ভক্তি বিনে ঈশ্বর লাভ হয় না—এই ত গেল প্রথম কথা।

তারপর, এই সাধন-ভক্তি দুই প্রকার।—

বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি

এইত সাধন-ভক্তি দুই তো প্রকার।
এক বৈধী ভক্তি রাগানুগা ভক্তি আর॥
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ২২শ পঃ)

বৈধী ভক্তি কিরূপ ?—

রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।
বৈধী ভক্তি বলি তারে সর্ব্ব শাস্ত্রে গায়॥

এই বৈধী ভক্তি প্রসঙ্গে প্রভু সনাতনকে কতকগুলি উপদেশ দিলেন।—

মহাপ্রভুর ধর্ম্মের নীতিবাদ, বৌদ্ধ ধর্ম্ম হইতে গৃহীত কি-না

অবৈষ্ণব সঙ্গ ত্যাগ, বহু শিষ্য না করিবে।
বহু গ্রন্থ কলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জ্জিবে॥
হানি লাভ সম শোকাদি বশ না হইবে।
অন্য দেব অন্য শাস্ত্র নিন্দা না করিবে॥
বিষ্ণু বৈষ্ণব নিন্দা গ্রাম্য বার্তা না শুনিবে।
প্রাণী মাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে॥…ইত্যাদি
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ২২শ পঃ)

যাঁহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মে বাঙ্গলার বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রতিধ্বনি খুঁজেন—তাঁহারা মহাপ্রভু কর্ত্তৃক সনাতন শিক্ষার নীতিবাদের মধ্যে সম্ভবতঃ কিছু পাইতে পারেন। তন্ত্রের মধ্যে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের স্ফুলিঙ্গ পাওয়া যায় না, এমন নহে। তবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অহিংস নীতিবাদের মধ্যেই বৌদ্ধ-ধর্ম্মের চিহ্ন সম্যক সুপরিস্ফুট।—

'প্রাণী মাত্রে মনবাক্যে উদ্বেগ না দিবে।'

ইহার পর রাগানুগা ভক্তি। ইহার অধিকারী ব্রজবাসী, বিশেষতঃ ব্রজগোপীগণ।—

শাস্ত্র যুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি।
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ২২শ পঃ)

রাগানুগা ভক্তি, বৈধী ভক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহার পরে প্রয়োজন বিভাগ। ইহা যেন রাগানুগা ভক্তির স্বাভাবিক পরিণতি। প্রয়োজন অর্থ, প্রেম। কৃষ্ণে রতি গাঢ় হইলেই প্রেম অভিধান পায়। রতি পাঁচ প্রকার—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। মধুর রতিই শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণভক্তি রসরূপে পরিণতি লাভ করে। রসের অবলম্বন নায়ক ও নায়িকা।—

"ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ নায়ক শিরোমণি।
নায়িকার শিরোমণি রাধা ঠাকুরাণী॥"

চৈতন্যচরিতামৃতের মতানুযায়ী, অভিধেয় ও প্রয়োজন অধ্যায়ের অতি সংক্ষেপে আমি আভাস দিলাম। ইহার কোন কোন ব্যাখ্যা প্রচলিত মতের সহিত যদি না মিলে, তবে দুঃসাহসের উপর নির্ভর করিয়া সে-দায়িত্বও নিজের উপরই রাখিলাম।

সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন—এখন, এই তিনটি আমরা দেখিতে পাইলাম যে, সোপানপরম্পরার মত একের পর আর সম্মুখে আসিয়া উপনীত হইতেছে।. মনোবিজ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তির উপর এই

শিক্ষাপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত। মহাপ্রভু-বর্ণিত দার্শনিক মতবাদ লইয়া পণ্ডিতসমাজে বিরোধ থাকিতে পারে। পূর্ব্বেও ছিল। এখন না-থাকিলেই আশ্চর্য্য হইবার কথা। কিন্তু এই শিক্ষা ও দীক্ষা প্রণালী এমন প্রণালীবদ্ধ এবং সুসংবদ্ধ যে—যদি কেহ এই সাধনপথে অগ্রসর হন, তবে তিনি ইহার মনোহারিত্ব ও উপকারিতা উপলব্ধি না-করিয়া পারিবেন না। সম্বন্ধ বিভাগ—ঐশ্চর্য্যে আরম্ভ হইয়া মাধুর্য্যে শেষ হইয়াছে। পরে অভিধেয় বিভাগ—বৈধী ভক্তিতে আরম্ভ হইয়া রাগানুগা ভক্তিতে শেষ হইয়াছে। রাগানুগা ভক্তির পরিণামস্বরূপ প্রয়োজন বিভাগ পিরীতিরস লইয়া আপনি আসিয়া দেখা দিয়াছে। মনোবিজ্ঞানের মাপকাঠিতে পাঁচ শতাব্দী পূর্ব্বের বাঙ্গালী বৈষ্ণবের এই ধর্ম্মশিক্ষাপদ্ধতি আধুনিক জগতের যে-কোনো প্রসিদ্ধ ধর্ম্মশিক্ষা-পদ্ধতির নিকট সগৌরবে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে। যদি না-পারে, তবে সে-অপরাধ বাঙ্গালী জাতির। মহাপ্রভুর কিংবা কবিরাজ গোস্বামীর নহে।

এদিকে, হুসেন শাহ গৌড়ে রাজত্ব করিতেছেন। তাঁহার রাজত্ব শেষ হইতে মাত্র তিন বৎসর বাকী। তাঁহার প্রধানমন্ত্রী দবীর খাসকে লইয়া কাশীতীর্থে বসিয়া মহাপ্রভু এইসব কাণ্ড করিতেছেন। বৈষ্ণব আন্দোলনকে ইতিহাস-পথে চালু করিবার জন্য মহাপ্রভুর কোনো সংগঠনশক্তি ছিল না—একথা যে বলে, সে শুধু অনভিজ্ঞ নয়। আরো কিছু।*

সনাতনের শিক্ষা ও দীক্ষা সমাপ্ত হইল।

তারপর প্রভু সনাতনকে কিছু কাজের ভার দিয়া অনুরোধ করিলেন।—

পূর্ব্বে প্রয়াগে আমি রসের বিচারে।
তোমার ভাই রূপে কৈল শক্তি সঞ্চারে॥

* Vaishnava Faith And Movement In Bengal—*Dr. S. K. De*, pp. 77—78.

তুমিহ করিহ ভক্তি শাস্ত্রের প্রচার।
মথুরায় লুপ্ত তীর্থের করিহ উদ্ধার॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ সেবা বৈষ্ণব আচার।
ভক্তিস্মৃতিশাস্ত্র করি করিহ প্রচার॥
যুক্ত বৈরাগ্য স্থিতি সব শিক্ষাইল।
শুষ্ক বৈরাগ্য জ্ঞান সব নিষেধিল॥
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ২৪শ পঃ)

ইহার পর সনাতন প্রভুর কাছে একটি আবদার করিলেন—দীক্ষিত শিষ্য, গুরুর নিকট যা করিতে পারেন। সনাতন বলিলেন: সার্ব্বভৌমের নিকট তুমি আত্মারাম শ্লোকের নাকি আঠার রকম ব্যাখ্যা করিয়াছিলে। তাহা আমাকে বল। শুনিতে আমার মন খুব উৎকণ্ঠিত।

প্রভু বলিলেন: আমি বাতুল। আমার বাতুলতাকেই সার্ব্বভৌম সত্য বলিয়া মনে করে।—

'কিবা প্রলাপিলাম তার কিছু নাহি মনে।'

তথাপি তোমাকে বলিতে গিয়া যদি কিছু মনে হয়—তবে বলি, শুন। এই বলিয়া তিনি আত্মারাম শ্লোকের ৬১ রকমের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করিলেন।—

"একষষ্টি অর্থ এবে স্ফুরিল তোমা সঙ্গে।
তোমার ভক্তিবশে উঠে অর্থের তরঙ্গে॥"

এত বিভিন্ন রকমের ব্যাখ্যা শুনিয়া সনাতন ত একেবারে বিস্মিত ও স্তব্ধ। তারপর সনাতন প্রভুকে বলিলেন—

"সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
তোমার নিঃশ্বাসে সব বেদ প্রবর্ত্তন॥"

প্রভু সনাতনকে স্তব করিতে নিষেধ করিলেন।

"প্রভু কহে কেন কর আমার স্তবন।"

সর্ব্বত্র সকলকেই তিনি এইরূপ নিষেধ করিয়াছেন। তথাপি বৈষ্ণবের নিকট 'সাক্ষাৎ ঈশ্বর' ভিন্ন আর কিছু তিনি নহেন। তারপর সনাতন বলিলেনঃ তুমি যে আমাকে বৈষ্ণব সমাজের স্মৃতিশাস্ত্র লিখিতে আদেশ করিলে, আমি ত 'নীচ জাতি', আমি স্মৃতিশাস্ত্র লিখিলে কি তাহা চলিবে ?

প্রভু কহে যে যে করিতে তুমি করিবে মনন।
কৃষ্ণ তাঁহা তাঁহা তোমা করাবে স্ফুরণ ॥
—(চৈঃ চঃ—মধ্য, ২৪শ পঃ)

সনাতন বলিলেনঃ বেশ, তবে 'সূত্র' করিয়া দেও। প্রভু বলিলেনঃ আচ্ছা, 'সূত্ররূপ শুন দিগ্‌দরশন'। প্রভু সনাতনকে গ্রন্থের বিষয়-সূচী বলিয়া দিলেন। এইরূপে হরিভক্তিবিলাসের বিষয়-সূচী স্থিরিকৃত হইল কাশীতীর্থে। ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে।

কিন্তু ইতিহাস আমাদিগকে এই সম্পর্কে অন্য কথাও বলে। বেঙ্কট ভট্টের পুত্র গোপাল ভট্ট—যাঁহাকে প্রভু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে বালক অবস্থায় দেখিয়াছিলেন—তিনিই হরিভক্তিবিলাস রচনা করেন। পরে সনাতন গোস্বামী ঐ গ্রন্থ সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া বর্ত্তমান আকার প্রদান করেন।

সনাতনের শিক্ষা সমাপ্ত হইল। আদেশমত কাজের ভার লইয়া সনাতন মথুরায় চলিয়া গেলেন। প্রভু নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন।

অতঃপর শ্রীরূপ নীলাচলে আসিয়া নাটকাদি লিখিলেন। ইহাতে দশমাস কাটিয়া গেল। পরে তিনি গৌড়ে চলিয়া গেলেন। শ্রীরূপ চলিয়া যাওয়ার দশদিন পর সনাতন মথুরা হইতে ঝাড়িখণ্ড-পথে নীলাচলে আসিয়া মহাপ্রভুর নিকট একবৎসর থাকিলেন। সনাতন বৈশাখ মাসে আসিলেন। রূপ যে একবৎসর গৌড়ে, সনাতন সে একবৎসর নীলাচলে।—

নীলাচল হৈতে রূপ গৌড়ে যবে গেলা।
মথুরা হৈতে সনাতন নীলাচলে আইলা॥
—(চৈঃ চঃ—অন্ত্য, ৪র্থ পঃ)

মহাপ্রভুর সহিত শ্রীসনাতনের এই তৃতীয় সাক্ষাৎ সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘকাল স্থায়ী। ইহাই শেষ সাক্ষাৎ। ইহা ১৫১৭ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। তখন গৌড়ে হুসেন শাহের রাজত্ব শেষ হইবার মাত্র দুই বৎসর বাকি। এবং মহাপ্রভুর শেষ দ্বাদশ বৎসরের দিব্যোন্মাদ আরম্ভ হইবার চার বৎসর মাত্র বাকি।

এই সাক্ষাতে গৌড়ের ভক্তগণের সহিত প্রভু শ্রীসনাতনকে পরিচয় করাইয়া দেন। গৌড়ে যিনি হুসেন শাহের প্রধানমন্ত্রী, 'দবীর খাস্' নামে বিখ্যাত ছিলেন—সেই অমিত ক্ষমতাশালী রাজমন্ত্রী এক্ষণে মহাপ্রভুর প্রধান শিষ্য। ছেঁড়াকাঁথা করঙ্গহাতে সনাতন গোস্বামী। শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভৃতি সনাতনের এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া নিশ্চয়ই বিস্মিত পুলকিত স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন, শ্রীরূপ-সনাতনের আগমনে বৃন্দাবনে লুপ্ততীর্থ উদ্ধার হইয়া একটি অভিনব বৈষ্ণব সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিতেছে। ইহা মহাপ্রভুর পরিকল্পনা। শ্রীসনাতন, ঠাকুর হরিদাসের বাড়ীতেই একত্র বাস করিতেন। হরিদাস ও রূপ-সনাতন, এই তিনজনের কেহ কখনও জগন্নাথের মন্দিরে গিয়া জগন্নাথ দর্শন করিতেন না। সম্ভবতঃ শ্রীরূপ-সনাতনের বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাদের গাত্রে মুসলমানী ছোঁয়াচ লাগিয়াই ছিল।

ঝাড়িখণ্ডপথে আসিতে শ্রীসনাতনের গাত্রে কণ্ডুরসা হইয়াছে। সনাতন এই ব্যাধির আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য জগন্নাথের রথচক্রের নিম্নে পতিত হইয়া আত্মহত্যা করিবার সংকল্প করিলেন। প্রভু ইহা জানিতে পারিলেন।

জানিতে পারিয়া বলিলেন—

"সনাতন দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাইয়ে।
কোটি দেহ ক্ষণেকে তবে ছাড়িতে পারিয়ে॥

দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই পাইয়ে ভজনে।
কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় কোনো নাহি ভক্তি বিনে॥
দেহত্যাগাদি সব তমোধর্ম্ম।
তমো রজো ধর্ম্মে কৃষ্ণের না পাইয়ে মর্ম্ম॥"

সনাতনের আত্ম-হত্যার সঙ্কল্প—মহাপ্রভুর নিষেধ

তারপর সনাতনকে বলিলেন যে, তোমার দেহ প্রাকৃত নয়। অপ্রাকৃত।—

"অপ্রাকৃত দেহ তোমার প্রাকৃত কভু নয়।
তথাপি তোমার তাতে প্রাকৃত বুদ্ধি হয়॥"

দীক্ষাদানকালে শিষ্য গুরুকে দেহ ও মন সমর্পণ করে। সুতরাং সনাতনের দেহ আর সনাতনের নয়। ঐ দেহ মহাপ্রভুর। তাহাকে নাশ করিতে চাহিলে পরের দ্রব্য চুরি করা হয়। প্রভু হরিদাসকে বলিলেন: সনাতন "পরের দ্রব্য ইহ করিতে চাহেন বিনাশ"। তা'ছাড়া সনাতনের দেহে আমি অনেক কাজ করিব।—

এতো সব কর্ম্ম আমি যে দেহে করিব।
তাঁহা ছাড়িতে চাহ তুমি কেমতে সহিব॥
—(চৈঃ চঃ—অন্ত্য, ৪র্থ পঃ)

দীক্ষাদানকালে গুরু, শিষ্যের দেহে নিজের অপ্রাকৃত দেহ আরোপ করেন। ইহাকে বলে অধ্যাস। সুতরাং সনাতনের আত্মহত্যা করা চলে না।

এদিকে জগদানন্দ পণ্ডিত সনাতনকে বুদ্ধি দিল যে: তুমি বৃন্দাবন চলিয়া যাও। ইহা শুনিয়া প্রভু অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন।

বলিতে লাগিলেন—

কালিকার বড়ুয়া জগা ঐছে গর্ব্বী হৈল।
তোমা সবাকেই উপদেশ করিতে লাগিল॥
ব্যবহারে পরমার্থে তুমি তার গুরু তুল্য।
তোমারে উপদেশ করে না জানে আপন মূল্য॥

আমার উপদেষ্টা তুমি প্রাণাধিক আর্য্য।
তোমারে উপদেশে বালক করে ঐছে কার্য্য ॥

* * *

জগদানন্দ প্রিয় আমার নহে তোমা হৈতে।
মর্য্যাদা লঙ্ঘন আমি না পারি সহিতে ॥
কাঁহা তুমি প্রামাণিক শাস্ত্রে প্রবীণ।
তুঁহা জগা কালিকার বটুক নবীন ॥
আমাকে বুঝাইতে তুমি ধর শক্তি।
কত ঠাঞি বুঝাঞিছ ব্যবহার ভক্তি ॥
তোমারে উপদেশ করে না যায় সহন।
অতএব তারে আমি করি যে ভর্ৎসন ॥

—(চৈঃ চঃ—অন্ত্য, ৪র্থ পঃ)

সনাতনের প্রতি প্রভুর যে মনোভাব, তাহা ইহা হইতেই স্পষ্ট উপলব্ধি হয়।

তারপর—

"দোলযাত্রা দেখি প্রভু তারে বিদায় দিলা।
বৃন্দাবনে যে করিবা সব শিক্ষাইলা ॥"